ভার্চুয়াল প্রেম

বেগম জাহান আরা

আইডিয়া প্রকাশন
সাহিত্য-সংস্কৃতি
জ্ঞানচর্চা, ইতিহাস-ঐতিহ্য
সংগ্রহ, সংরক্ষণকেন্দ্র

www.ideaabd.com

প্রকাশক মাসুদ রানা সাকিল
আইডিয়া প্রকাশন
রংপুর, বাংলাদেশ
✆+৮৮০১৭২৬ ৯৭৬৯৮২
© লেখক
প্রথম প্রকাশ মে ২০২২
প্রচ্ছদ সাকিল মাসুদ
মুদ্রণ ও গ্রাফিক্স আইডিয়া প্রেস, রংপুর
মূল্য ৩০০ টাকা
অনলাইন পরিবেশক আইডিয়া.বাংলা
রকমারি ডট কম
দারাজ ডট কম

Virtual Preem Begum Jahan Ara
Publisher *Masud Rana Shakil*
IDEA PROKASHON
Rangpur, Bangladesh
e-mail *adideabd@gmail.com*
Price *300 TK. $15*
ISBN *978-984-96119-9-8*

আধুনিক মুক্ত মনের প্রজন্মদের
যাঁদের জন্য বাঁচার ইচ্ছেটা মরেনি এখনও

কিছুকথা

বেগম জাহান আরা'র শতাধিক বই প্রকাশ হয়েছে। তাঁর মধ্যে বানান বিষয়ক গবেষণার বই 'প্রমিত বাংলা বানান: সমস্যা প্রসঙ্গ', উপন্যাস- 'অভিবাসী', 'কত অচেনারে', 'উজান-ভাটি' বইগুলো প্রকাশ করেছি। এবারে ছোটোগল্পের বই প্রকাশ করলাম।

তাঁর লেখার যে দিকটি আমাকে প্রবল আকর্ষণ করে তা হলো পড়তে শুরু করলে শেষ না হওয়া অব্দি পিপাসা থাকে। একটা গল্প পড়লে মনে হয় পরেরটা পড়ি। গল্পের চরিত্রগুলো খুব চেনাজানা কাছের মানুষের। কখনো কখনো নিজেকে খুঁজে পাই তাঁর গল্পের চরিত্রে।

প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদি, ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থাকে স্পর্শ করার নেশায় মানুষ সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে হারিয়ে ফেলছে শেকড়ের পিছু টান। দূরত্ব বাড়তে বাড়তে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে বাঙালি সংস্কৃতির মায়া-মমতায় ঘেরা পরিবার, পরিজন সমাজ ব্যবস্থা থেকে। কেউ কেউ সুখের আশায় পাড়ি জমাচ্ছেন বিদেশের মাটিতেও। সব মিলিয়ে বলা যায় মানুষ এবং পৃথিবী যান্ত্রিকতার যুগে প্রবেশ করেছে।

জীবনের পরিশেষে প্রেম-ভালোবাসা পাওয়ার চেয়ে, দেওয়াতেই যে প্রকৃত সুখ। 'ভার্চুয়াল প্রেম' বইয়ে বেগম জাহান আরা সে ইঙ্গিতই দিয়েছেন। কিন্তু লাভ-ক্ষতির এই পৃথিবীতে সে দৃষ্টান্ত ধরে রাখা বিরল।

বিংশ শতকের আগে এ দেশের মানুষের ভাবের বহিঃপ্রকাশ, প্রেম আদান-প্রদান কখনো কখনো অপ্রকাশিত থেকে যেতো। অথবা অপেক্ষার পর অপেক্ষা শেষে কখনো কখনো সেই ভাব বিনিময় হতো চিঠিতে, সেও ছিল দুঃসাহসিক কাণ্ড। কিন্তু স্মার্টফোনের যুগ মানুষের সেই দূরত্ব কমিয়ে এনেছে, নিজের মনের ভাব প্রকাশ সহজ করেছে। নারী-পুরুষকে করেছে অন্তরঙ্গ। জীবনযাত্রার মান বিবর্তনে মুখ্য ফেসবুক, টুইটার, স্কাইপিসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম।

জীবন, পরিবার, সমাজ, সংস্কৃতির সৌন্দর্য আত্মিক সৌহার্দ্যের সৌন্দর্যের উপর ভিত্তি করে হয়। বাবা, মা, প্রিয়জন, প্রিয়তম-প্রিয়তমা, সন্তান-সন্ততি, স্বামী-স্ত্রী, শ্বশুর-শাশুড়ি, বন্ধু-বান্ধব পরিচিতজন আর কর্মময় দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা এই সৌন্দর্যের অংশ। এর সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত দায়িত্ব, কর্তব্য, ত্যাগ,

ভালোবাসা, মান-অভিমান, অভিযোগ, আদর-স্নেহ ইত্যাদি নানান কিছু।

বেগম জাহান আরা এর লেখা 'ভার্চুয়াল প্রেম' বইটি মূলত জীবনের বর্ণনামূলক উপাখ্যান, জীবন ভাঙা-গড়া, সুখ-দুঃখ, উত্থানপতন। গল্প যারা ভালোবাসে বইটি এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলবেন বোধ করি।

বইটি প্রকাশের আগের কথা: এবারের বইমেলা অর্থাৎ ২০২২ এর অমর একুশে বইমেলায় তাঁর লেখা উপন্যাস 'উজান ভাটি' প্রকাশের পর 'ভার্চুয়াল প্রেম' প্রকাশের কাজ করছিলাম। চূড়ান্ত করে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বেগম জাহান আরা'কে ফোন করি। তিনি জানালেন হাসপাতালের সিসিইউতে। বর্ণবিন্যাস করা শেষ হয়েছে শুনে তিনি বললেন প্রেসে দিয়ে দাও। বাকিটা তুমি দেখে দিও। ওইটুকুই ছিল কথা। তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনায় এনে কথা বাড়ালাম না। অথচ জিজ্ঞেস করা দরকার ছিল বইটিতে উৎসর্গ পাতায় কী লিখবো?

২ মার্চ পর্যন্ত মোবাইলে অনেকবার যোগাযোগের চেষ্টা করলাম। কোনো খবর পেলাম না! বইমেলা শেষ হয়ে গেলো? তিনি ২২ মার্চ ২০২২ প্রায় এক মাস পর ফেসবুক মেসেঞ্জারে কল করলেন। দেখে আনন্দিত হলাম। তিনি জানালেন, সিসিইউতে ছিলেন অনেকদিন। বইটি প্রকাশ করেছি কিনা? এরপর কুশল বিনিময় শেষে বললেন, বইটি প্রিয় পাঠকদের উৎসর্গ করে প্রেসে দিয়ে দাও। আজ প্রেসে দিতে পেরে, দায়িত্ব পালনের আনন্দ লাগছে...।

বেগম জাহান আরা- একজন সফল শিক্ষক, কথাসাহিত্যিক এবং ভাষাবিজ্ঞানী। ১৯৫২ সালে রাজশাহীর ভাষা আন্দোলনে মিটিং-মিছিলে অংশ নেন।

গবেষণাধর্মী লেখা শুরু পুনেতে অধ্যয়নকালে। দেশে ফিরে বাংলাভাষা শেখার বই, পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ, গল্প এবং উপন্যাস লেখেন। বিদেশিদের জন্য তাঁর প্রথম বই 'বাংলাদেশের কথা' প্রকাশ ১৯৭৯। প্রথম উপন্যাস 'অয়নাংশ' ১৯৮৫। বর্তমানে তিনি শতাধিক গ্রন্থপ্রণেতা।

তাঁর জন্ম ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭ খ্রি; দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলায়। বাবা মুহাম্মদ আজিজুর রহমান চাকরির সুবাদে দিনাজপুরে ছিলেন। মা হাসিনা খাতুন বই পড়তে ভালোবাসতেন। তারপর শিশুকালেই চলে আসেন বাবার স্থায়ী বাসা রাজশাহী সদরের হাতেম খান পাড়ায়। ধর্মপরায়ণ পরিবারে সাত ভাইয়ের এক বোন বেগম জাহান আরা। একান্নবর্তী পরিবারে কেটেছে সহজ সরল জীবন। তাঁর বাবার বাড়িতে নিয়মিত গানের চর্চা ছিলো।

শিক্ষা জীবন কাটিয়েছেন রাজশাহী জুনিয়র মাদ্রাসা থেকে ক্লাস সিক্স। তারপর

ভর্তি হন রাজশাহী পিএন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ হতেই বিয়ে হয়ে যায়। প্রতিকূল পরিবেশে সংসার সন্তান সামলে ১৯৫৫ সালে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেন আইএ। ১৩ বছর বিরতির পর ১৯৬৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দ্বিতীয় বিভাগে বিএ পাশ করেন (মেধা তালিকায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম, প্রথম বিভাগ কেউ পায়নি)। তারপর ১৯৭৩ সালে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে (বাংলায় প্রফিশিয়েন্সি) বি এড পাশ করেন। ১৯৭৪ সালে (১৯৭২-এর ব্যাচ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করে এম এ ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৮০ সালে ভারতের পুনে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাবিজ্ঞানে এমএ (এক বছর মেয়াদী) এবং ১৯৮২ সালে ভাষাবিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন (ফল প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ সালে)। তাঁর থিসিসের বিষয় ছিলো 'প্রোনোমিনাল ইউসেজ এন্ড এপেলেটিভস ইন বাংলা'।

এছাড়াও ১৯৭৭ সালে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট পরিচালিত জাপানি শর্ট কোর্স; ১৯৮২-৮৩ সালে পুনেতে এসপেরান্তো ভাষায় জুনিয়র সার্টিফিকেট (শর্ট কোর্স)। ১৯৮৭ সালে জার্মান কালচারাল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, থেকে জার্মান ভাষায় জুনিয়র সার্টিফিকেট এবং ১৯৮৮ সালে জার্মান ভাষার 'সিনিয়র সার্টিফিকেট' কোর্স সমাপ্ত করেন। স্কুলে সঙ্গীত ছিলো তাঁর অন্যতম বিষয়। ম্যাট্রিকে ততকালীন পুর্ব পাকিস্তানে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন।

কর্মজীবনঃ ১৯৭৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে শিক্ষক পদে যোগ দেন, ১৯৮৮ খ্রি. সহযোগী অধ্যাপক, ১৯৯৩ খ্রি. অধ্যাপক পদে উন্নতি লাভ করেন, ২০০১ খ্রি. অবসরে যান। ১৯৭৬-৭৯ সালে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন (ন্যাশনাল কারিকুলাম কমিটি) কমিটিতে' বাংলা ভাষা বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করেন। ১৯৮৩-৮৭ 'বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থা'র জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন। ১৯৮৫ সালে বিশ্বনারী সম্মেলনে নাইরোবিতে (কেনিয়া) যোগ দেন। ১৯৮৭ সালে সার্ক নারী হস্তশিল্প প্রদর্শনীতে সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে মালদ্বীপ যান। ১৯৯২ খ্রি. কলকতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেলোশিপে যান ১৬টা লেকচার দেন, রবীন্দ্রভারতী এবং কলকতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচার দেন, হায়দ্রাবাদে আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৯৩ খ্রি. বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ইংলিশ স্পিচ কম্পিটিশিনে দলনেতা হিসেবে বস্টনে যান। একই সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়য় ডেবেটিং সোসাইটির

পক্ষ থেকে ছাত্রদের নিয়ে কুয়ালালামপুরে যান। ১৯৯৪ সালে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৩-৯৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কুয়েত মৈত্রী' হলে প্রোভস্টের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৪-১৯৯৬ সালে চিন সরকারের আমন্ত্রণে বেইজিংএ 'চিন আন্তর্জাতিক বেতারে'র বাংলা প্রোগ্রামে বিদেশি বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করেন। ১৯৯৫-৯৬ সালে বেইজিং ব্রডকাস্টিং ইনস্টিটিউটে (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়) চিনা ছাত্রদের বাংলাভাষা পড়ান। ২০০০সালে দক্ষিণ কোরিয়ার সাউলে 'LBLv'(KOIKA) প্রোগ্রামে, কোরিয়ান সরকারের আমন্ত্রণে বাংলা ভাষার শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। ২০০১-২০০২ (এক বছর) 'বাংলাদেশ শিশু একাডেমি'র পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। শ্রীলঙ্কা এবং ব্যাংককে সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে শিশু সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় অংশ নেন।

২০০৭-২০১৪ পর্যন্ত একটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইউল্যাব) অ্যাডজাংট প্রফেসর হিসেবে শিক্ষকতা করেন। ১৯৭২-২০১৬ সাল পর্যন্ত রেডিও এবং টেলিভিশনের অসংখ্য অনুষ্ঠান পরিচালনাসহ গান গেয়েছেন।

কর্মজীবনে বহু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সেমিনারে প্রবন্ধপাঠ করেন। সরকারের ডেলিগেট হয়ে ভারতসহ কয়েকটা দেশে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। সাংবাদিকতা করেছেন প্রায় ৮ বছর। ১৯৭০ সালে, সোনার বাংলা' সাপ্তাহিকে মহিলা পাতার সম্পাদক। বাংলার বাণীতে ১৯৭৩-৭৫ অগাস্ট পর্যন্ত সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। দৈনিক সংবাদে ১৯৭৫-১৯৭৯ পর্যন্ত মহিলা পাতার সম্পাদনা করেছেন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এখনও উপসম্পাদকীয় এবং সাহিত্য পাতায় লেখেন। কয়েকটা অন-লাইন পত্রিকায় লেখেন।

পুরস্কারঃ ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাবিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃতি স্বরূপ ক্রেস্ট সম্মাননা; কথাসাহিত্যে স্বর্ণপদক, দেওয়ান মো. আজরফ ফাউন্ডেশন; সাহিত্যে লেখিকা সংঘ পদক; সাহিত্যে স্বর্ণপদক, কেন্দ্রীয় লালন পরিষদ, ঢাকা; ভাষাসৈনিক পুরস্কার, বঙ্গমাতা পরিষদ; সাহিত্যে 'কমর মুশতারী স্মৃতি' পুরস্কার; 'চয়ন' সাহিত্য পুরস্কার; সঙ্গীতে ১০টি স্বর্ণপদক এবং ২০টি রৌপ্যপদক।

সাকিল মাসুদ
প্রকাশক
০১ মে ২০২২

গল্পক্রম

দুর্গন্ধ ১৫
দুর্নীতির কাহিনি ২৪
জোছনার মতো ভালোবাসা ৩১
অগোচর ৪৩
কাঠগড়া ৫৫
প্রতীক্ষা ৬৪
পূর্বরাগ এবং তারপর ৭৩
প্রজাপতি ৮৪
চাওয়া পাওয়া ৯৪
ব্যথা ১০৪
অস্তিত্ব সংকট ১১১
অসূয়া কন্যা ১২০
বাসনা কুন্তল ১৩০
দ্বিতীয় মাতৃত্ব ১৩৭
শাখামৃগ বৃন্দ ও নালায়েক যুবকটা ১৪৫
ভার্চুয়াল প্রেম ১৫৫

দুর্গন্ধ

প্রতি শনিবারে সপ্তার বাজার আসার আগেই ফ্রিজ পরিষ্কার করে সানিয়া। কাজটা রুটিন অনুসারেই করে। কিন্তু এই কাজটা শাশুড়ি যেনো দেখতে না পান, সেদিকে দৃষ্টি রাখে। ঘরের মানুষটা বেরিয়ে যায় সাত সকালে। এই সব দেখার সময় নেই তার। ইচ্ছেও নেই। সানিয়া যা করে, তাতেই তার সমর্থন। সপ্তায় একবার বাজার করাটাও তার জন্য রুটিন বাঁধা কাজ। ঝুমি বাবু ঘরে না আসা পর্যন্ত এই নিয়মেই চলেছে। তারপর তাকে গাড়িতে নিয়ে যেতে হয়েছে বাজারে। কষ্ট হলেও উপায় নেই। উন্নত জীবনের আশায় অভিবাসী হয়েছে রায়হান। সুখ কেনার কষ্ট সইতে হয়। কিছু বলার নেই কাউকে।

প্রতি সপ্তায় ফ্রিজ পরিষ্কারের সময় খুঁটি নাটি পুরনো খাবার জিনিস ফেলে দিতে হয়। তারিখ চলে যাওয়া জিনিস কিছুতেই খাবে না ঝুমি। স্কুলে শিখিয়েছে। কেনা জিনিসের সবটুকু চেঁছে পুছে খাওয়া সহজ নয়। মানে, খাওয়ার পরেও প্যাকেটে বেশ কিছুর শেষটুকু জমে থাকে ফ্রিজে, সেগুলো গুছিয়ে বের করলে অনেক কিছু মনে হয়। আসলে তা নয়। শাশুড়ি সেটা মানতে পারেন না। বলে, এই সব বৌয়ের বড়োলোকিয়ানা। বাসি জিনিস তাঁরা নিজেরাই কি কম খেয়েছেন? একটু গন্ধ-টন্ধ উঠলে কাজের লোকদের দিয়েছেন। ওঁরা গরম করে, সেঁকে ভেজে খেয়ে নিয়েছে। এখন আমি খেয়ে নিতে পারি। তা নয়, ফেলে দিতে হবে। ঠাণ্ডা দেশে তো খাবারে গন্ধ-টন্ধও ওঠে না সহজে। তবু ফেলে দিতে হবে।

তিন মাসের জন্য বেড়াতে এসেছেন রাহেলা খাতুন ছেলের বাড়ি। প্রথম প্রথম খুব ভালো সময় কেটেছে সকলের। সকালের এক ঘেয়ে খাবার, রুটি, মাখন, চিজ, ডিম, জ্যাম, জেলি, বাদাম, ফলমূলই খাওয়া হতো সপ্তার সাত দিন। তার বদলে এখন উইকেন্ডের দুটো দিন নানান রকমের নাশতা বানাচ্ছেন রাহেলা। নানান রকম পিঠা, চালবিরান, মুগ ডালের ভুনা খিঁচুড়ি,

পরাটা মাংস, লুচি তরকারি, মিহি করে কাটা আলুভাজি, ইত্যাদিতে উচ্ছল হয়ে ওঠে সকালের নাশতার টেবিল। রাতে ডিনারের টেবিলে ফিরনি, গাজরের হালুয়া, ডিমের হালুয়া, রসমালাই, ছানার সন্দেশ প্রায় দেখা যায়। বিকেলে কোনোদিন সবজির সামুসা বা কলিজার সিঙাড়া বানাতেন রাহেলা। মধ্যবিত্ত সংসারের গৃহিনী হিসেবে রান্নাই তো করেছেন সারা জীবন। ভালোই লেগেছে। সবাইকে খাইয়ে একটা তৃপ্তি পেতেন।

আট বছরের ছোট্ট ঝুমি বাংলাদেশি খাবার পেয়ে খুব খুশি। কেমন করে যে তার দেশি রুচি হয়েছে, সেটাই আশ্চর্য হয়ে ভাবেন দাদি রাহেলা। তার জন্য খাবারগুলো শুধু অপরিচিত নয়, একটু গুরুপাকও। কিন্তু তার পছন্দ। তাই খাবে। একবার পেটে সমস্যাও হলো। সামান্য ওষুধপত্র খেতে হলো। আবার যখন পেটে সমস্যা হলো, তখন সানিয়া স্পষ্টই বললো, গুরুপাক রান্না ঝুমিকে দিবেন না মা।

কিন্তু তা কি আর হয়? বাসায় ভালো মন্দ রান্না হলে বাচ্চা কি না খেয়ে থাকতে পারে? ঝুমি ভালোবেসে খেয়ে ফেলে। রায়হান তো ভালোবাসেই খেতে। খেতে ভালোবাসে সানিয়াও। কিন্তু সে তা স্বীকার করে না। দেখা গেলো খাওয়ার পরে লুচি বা পরাটা থেকে গেলো কয়েকটা। ঘুরে ফিরে সানিয়াই সেগুলো খায়। হাসেন রাহেলা খাতুন আপন মনে। গোপনে।

ঝুমির ধারণা হয়েছে, মা রান্না জানে না। তাই এগুলো খায়নি এতোকাল। একদিন বললো, দাদি চলে গেলে আর এই সব খেতে পারবো না।

রায়হান হেসে বলে, শুনছো সানিয়া, মেয়ে কি বলে?

-এতো কিছু খেতেই হবে কেনো? বিরক্ত হয়ে বলে সানিয়া।

-মাঝে মাঝে আমারও খেতে ইচ্ছে করে। রায়হান বলে।

-জানি তো, বাপ বেটির এক রকম মুখ।

-স্বাভাবিক না?

-বেশ তো, না খেয়েই যখন দিন কেটেছিলো এতোকাল, আবার কাটবে।

-সত্যি, ভুলেই গিয়েছিলাম এইসব খাবারের কথা।

-ভুলেই থাকতে হবে আবার।

-মানে?

-আমি এতো কষ্ট করে ওসব রান্না করতে পারবো না।

-ঝুমি চাইলে?

-ও তো বাচ্চা মানুষ, যা দেবো তাই খাবে। তুমি হলে ধেড়ে শেয়াল। ওকে উস্কানি না দিলেই হলো।

পাশের ঘর থেকে রাহেলা সব শুনছেন। বিশ্রি লাগে সানিয়ার কথা। স্বামীকে কেউ 'ধেড়ে শেয়াল' বলে? মুখটা বড্ড খারাপ বউয়ের। সব গুনের গোড়ায় নুন ঢেলে দেয়। জামানা উলটে গেছে। এখন আধুনিক বৌদের তেতো জবান শুনতে হয় শাশুড়িদেরকে। নাহলেই অশান্তি। তাছাড়া নানান রকম রান্না করতেই বা পারবে না কেনো? স্বামী সন্তানের আনন্দের জন্যই তো করতে ইচ্ছে করবে।

তরতর করে দিন কেটে যাচ্ছে। মায়ার বাঁধন কেটে চলে যেতে হবে দেশে। মনটা বিষণ্ন হয়ে থাকে। দুই ছেলে মেয়ে পৃথিবীর দুই প্রান্তে থাকে। মেয়ে থাকে অস্ট্রেলিয়া। ছেলে ক্যানাডা। ছোটো একখানা বাড়ি গাইবান্ধায়। অনেক কষ্টে মানুষ করেছেন সন্তানদের। টাকার কষ্ট নয়, পরিবেশের কষ্ট। মফস্বলের ছোটো শহরে লেখাপড়া করাতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয়েছে।

স্থানীয় কলেজের শিক্ষক মইনুদ্দীন প্রধান। এলাকারই মানুষ। জমি জিরেত আছে। পুকুর আছে। ধান চাল পাট বেচে হাতে কিছু আসে বছরে। অভাব নেই সংসারে। কপাল ভালো, যুগের হাওয়ায় চোখ কপালে তুলে বড়ো হয়নি ছেলেমেয়েরা। মেধাবী বলে দুটি ছেলেমেয়েই বৃত্তি নিয়ে পড়েছে। একেবারে কলেজ পর্যন্ত পড়েছে ঘরে থেকে। সেই ছেলেমেয়ে যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেলো, তখন রাহেলা কেঁদে কেটে সারা হতেন। সব মনে আছে। রাগী মানুষটাকে বলে কয়ে, হাতে পায়ে ধরে, রাজশাহী পাঠাতেন মাঝে মাঝে রান্না করা খাবার এবং পিঠাপুলি দিয়ে। ছোটো শহরে থাকলে কি হবে? এরকম একঘেয়ে খাবার তারা খায়নি।

আবার শনিবার এসেছে। ওরা দেরি করে উঠবে ঘুম থেকে। লুচির ময়দা ময়ান দিয়ে মেখে রাখেন রাহেলা। ডিম ভাজির জন্যে পেঁয়াজ কেটেছেন। যত্ন করে আলু কেটেছেন কুচি কুচি করে। তারপর নিজে এককাপ চা করেছেন খাবেন বলে। বেলা প্রায় দশটা বাজে।

সানিয়া রান্না ঘরে এসে আয়োজন দেখেই বলে, আমি কিন্তু লুচি খাবো না মা। বেশি তেলে ভাজা খেলে আমার খারাপ লাগে।

সকাল বেলাতেই মনে হলো হঠাৎ কালো মেঘ উড়ে এলো। আবছা আঁধারে ঢেকে গেলো চারদিক। গুমোট হয়ে উঠলো প্রকৃতি। পারেও মেয়েটা ফাটা ঢোলে ঘা দিতে। ঢ্যার-ঢেরে একটা বেসুর বেজে ওঠে। হাসি মুখে থাকলে কি হয়?

তারপর সান্ত্বনা পুরস্কারের মতো বললো, আপনারা লুচি পুরি ভাজি খান। আমি রুটি মাখন চিজ খেয়ে নেবো। সমস্যা নেই। কটকটে ঘোষণা প্রচার হলো।

তাই হলো। কিন্তু খাওয়ার টেবিলে কেউ হাসলো না। মন খুলে কথা বললো না। এমনকি খাবারগুলোও স্বাদ লাগলো না খেতে। ঝুমি একবার কি কারণে যেনো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলো, সানিয়া ধমক দিয়ে বললো, আস্তে কথা বলো। মেয়েটা জটিলতা বোঝে না। কিন্তু এটুকু বোঝে যে, নাশতার আইটেম মায়ের পছন্দ হয়নি। হয়তো আর একটা লুচি সে নিতো। কিন্তু মায়ের দিকে তাকিয়ে তিন নম্বর লুচি আর নিলো না। ডিম ভাজি রয়ে গেছে প্লেটে।

রায়হান বলে, তুমি লুচি নিলে না মা?

-খেলাম তো।

-ঝুমি আর তুমি সমান? মাত্র দুটো খেলে হবে? আর দুটো নাও।

- পরে খাবো বাবা। তুই নে না।

-আমি তো চারটে খেয়ে ফেলেছি।

-তাতে কি? ছোটো ছোটো লুচি। দুটো আরও নিতে পারিস।

-তা পারি।

সানিয়া হেসে ওঠে। অবহেলার হাসি।

-হাসির কী হলো? দশ বারোটা লুচি খাওয়া কোনো ব্যাপার? তুমিও পারবে। ঝুমি, তুমিও নাও দুটো।

-মাফ চাই ভাই। খাওয়ার কমপিটিশনে আমি নেই, সানিয়া বলে।

-মা তুমিও নাও, আমিও নিই। খেয়ে ফেলি সবাই আর দুটো করে। গরম গরম ফুলকো লোভনীয় লুচি না খেলে পস্তাতে হবে। রায়হান সর্দারি করে সবার পাতে তুলে দিলো লুচি। ঝুমির পাতেও। এমন একটা চেহারা বানালো সানিয়া!

তেতো হয়ে গেলো খাওয়ার পরিবেশ। কিন্তু খেলো সবাই। রাহেলার চোখে পানি এসে গেছে। অনেক কষ্টে চোখের পানি সামলে উঠে পড়েন তিনি। মনে পড়ে যায় নিজের সংসারের কথা। সেখানে প্রধানের ইচ্ছে মতোই রান্না খাওয়া হতো। কিন্তু এটাতো ছেলের বাড়ি। দুদিনের অতিথি সে। এখানেও অধীনতা! ভালোমন্দ রেঁধে খাওয়াতেও পারবেন না?

রান্না ঘরে হাত ধুচ্ছিলো রাহেলা। রায়হান ডাকলো, মা, অমা, লুচিগুলো রেখে দাও রাতে খাবো।

-এতো মা মা করো না তো, উঠে গিয়ে কথা বলো, সানিয়া বিরক্ত হয়ে বলে।

-তোমার সমস্যা কোথায়? রায়হানের উচ্চকণ্ঠ শুনে রাহেলা শংকিত হয়। ঝগড়া ঝাঁটি একেবারে পছন্দ নয় তার।

-আমার কোনো সমস্যা নেই। সানিয়া তাড়াতাড়ি বলে।

-তুমি যে দিনে দশবার ফোনে মায়ের সাথে কথা বলো। আমি বিরক্ত হই? কিছু বলি?

-আমার মা তো এখানে থাকে না। তাই ফোন করি। আর তোমার মা তো সামনেই আছে। কাছে গিয়ে কথা বললেই হয়। কটকট করেই বলে সানিয়া।

কথা ঠিক। কিন্তু বলার ভঙ্গীটাই শোভন না। 'তোমার মা' শুনতে কানে বাজে।

ঝুমি ঘুর ঘুর করছিলো দাদির কাছে। ওর হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলে গেলো সানিয়া।

সুখাদ্যের খোশবুতে ভরা ঘরটা কুটিল কষ্টের ছ্যাঁচড়া গন্ধে ভরে গেলো। থেকে যাওয়া টাটকা খাবারগুলো থেকে এমন গন্ধই বা কেমন করে উঠছে?

অবাক হয় রাহেলা। টপ টপ করে চোখের পানি ঝরে পড়ে হাতে ধরা আলুভাজির বাটির ওপর। কতো যত্ন নিয়ে মিহি করে কাটা আলু। এবার তো ফেলে দিতেই হবে। টাটকা ভাজি, তবুও। চোখের পানি তো খাওয়া যাবে না।

আর একদিন, এই খাবার টেবিলেই, সানিয়া ঝুমিকে চড় মারার জন্য হাত উঠিয়েছিলো। ধরে ফেলেন রাহেলা। উহ! সে কি রাগ! বলে, আমার বাচ্চাকে মারতেও পারবো না?

চেয়ার পেছনে ঠেলে দিয়ে উঠে চলে গেলো অন্য ঘরে। নাশতাই খাবে না। থামেই না রাগ। পায়ের স্যান্ডেল খুলে নিজের মাথায় মারলো কয়েক ঘা। এমন চণ্ডালে রাগ দেখেননি রাহেলা কোনোদিন। শাশুড়ির সামনে শালীনতার বালাই নেই। ভদ্রতা শোভনতা লজ্জা তো দূর অস্ত। কষ্ট পেয়েছিলেন রাহেলা খুব। বাচ্চাদের মারামারি হলে বড়োরা আড়াল করে। এটাই তো দেখে এসেছেন তিনি। মায়া মমতার সম্পর্কে এমনটাই তো হয়ে থাকে। ও কি দেখেনি এই সব?

নিজেকে নিজে বলেন রাহেলা, বাকি দিন কয়টা স্বস্তিতে কাটে যেনো। সম্মান নিয়ে চলে যেতে পারলে বাঁচি। প্রধানের শরীরটা ভালো থাকে না জানিয়েছে। পেট রোগা মানুষ। খাওয়ার অনিয়ম সহ্য করতে পারে না। কাজের খালা নাকি তরকারিতে তেল ঝাল বেশি দিচ্ছে। এই এক সমস্যা। এতো দিনের পুরনো মানুষ। ভরসা করা যায় না তবু। বিদেশে ছেলের বাড়ি বেড়ানোর হাউসে এসেছিলেন মানুষটাকে রেখে। আফসোস হয় এখন।

ঝুমি স্কুল থেকে এলে রাহেলাই খাবার এগিয়ে দিতেন। সেটাও বন্ধ হয়ে গেলো। ছুটে এসে সানিয়া খাবার দিতে দিতে বলে, আমি খাবার বেড়ে না দিলে মায়ের সম্বন্ধে ঝুমি খারাপ ভাববে, মা। সকালে স্কুলে যাওয়ার আগে ঝুমি চিরুনি নিয়ে কাছে আসতো। চুল আঁচড়ে বেনী গেঁথে দিতেন রাহেলা। একদিন ঝুমি বললো, থাক দাদি, বেনী করে দিতে হবেনা।

-কেনো সোনামতি? জট লেগেছে বেশি?

-মা বলেছে, বেনী করতে হবে না।

কোথায় কী ঘটেছে বুঝতে পারেন না রাহেলা! পৌত্রির সাথে সুন্দর সম্পর্কের সুরটা কেটে কেটে যাচ্ছে। রাতে ঘুমোবার আগে গল্প শুনতো

ঝুমি। নিজের বিছানা ছেড়ে দাদির বিছানায় বুকের কাছে ঘেঁষে ঘুমাতো। খরগোশের মতো নরম শরীর। মিষ্টি একটা শিশু শিশু গন্ধ। কী যে ভালো লাগতো রাহেলার! দু'তিন দিন থেকে মায়ের নির্দেশে একা নিজ বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে এতিম বাচ্চার মতো। খুব কষ্ট পেতেন রাহেলা।

কী নিয়ে একদিন ঝুমিকে বকতে গিয়ে সানিয়া বললো, মা-ই পৃথিবীতে সবচেয়ে আপন। সে কথা বুঝতে হবে তোমাকে!

-তাহলে তুমি এতো বকা দাও কেনো? দাদি কত্তো আদর করে! ঝুমি বলে।

-বকা দিলেও আমি তোমার মা। সেটা তো ঠিক, না কি?

-তুমি বেনী করে দিতে চাও না, তাই তো দাদির কাছে যাই।

-একা একা চুল আঁচড়াতে শেখো। বড়ো হচ্ছো না?

পাশের ঘর থেকে কিছু কিছু কথা শোনা যায়। বুক ফেটে যায় রাহেলার। এমন শিশুকে কেউ বড়ো বলে? বুঝতে পারে, বাচ্চাটা তাকে ভালোবাসে, এটা সানিয়ার ভালো লাগে না। দাদির সাথে ঘনিষ্ঠতা হোক, সেটা চায় না। হায়রে পাগল! দাদি আর কয়দিন থাকবে এখানে? দাদি নানিরা নাতি-পোতাদেরকে একটু বেশি বেশি ভালোবাসে, এটা নতুন কিছু নয়। ওরাও দাদি নানির কাছে একটু বেশিই আদর পায়। চিরাচরিত ঘটনা। এটাও পছন্দ হচ্ছে না সানিয়ার! দাদির ভাগে বেশি ভালোবাসা চলে যাচ্ছে? আত্মাটা এতো ছোটো হয় কেনো মানুষের?

রায়হানের সাথে গল্প করলে মুখ ভার হয় সানিয়ার। একদিন বলেছে, এতো গল্পও জানেন মা। অন্যেরা কথা বলার স্পেস পায় না। লজ্জা পেয়েছিলেন রাহেলা। বলে কী মেয়েটা? গুটিয়ে নেয় রাহেলা নিজেকে। রায়হান একান্তই তার। রাহেলার ভাগ নেই তাতে। ছেলে হিসেবেও না। এমন হয় কী করে? সম্পর্ক কি এতোই ঠুনকো? মা ছেলে কথা বললেও সানিয়ার ভাগে কম পড়ে যায়? মূঢ়! মূঢ়!

মাত্র দুসপ্তার মধ্যেই ঝুমি বদলে গেলো। সানিয়া সামনে না থাকলে দাদির গায়ের সাথে মিশে থাকে বেড়ালের মতো। সামনে থাকলে কথাই বলতে চায় না। বড়ো বড়ো চোখে বার বার তাকায়। কষ্ট লাগে রাহেলার। বাচ্চাটা বিভ্রান্ত হয়ে যাবে! মন উজাড় করে কাউকে ভালোবাসতে শিখবে না। সুন্দর সম্পর্কের মাঝে সানিয়া দুর্গন্ধ ঢেলে দিচ্ছে অকারণে। দেখা না গেলেও

বোঝা যাচ্ছে। একদিন তাকেও বুঝতে হবে, ভুল শিক্ষা দেয়ার ফল কেমন হয়? কিন্তু আসল কষ্ট তো পাচ্ছে বাচ্চাটা। ভালোবাসার সুবাসে প্রাণভরে লুটোপুটি খেতে পারছে না। যেটা তার পাওনা ছিলো। রাহেলা তো বুক ভরা আদর নিয়ে বসেই থাকে পৌত্রীর জন্য।

রায়হান মুখে কুলুপ এঁটেছে। ঝগড়া ঝাঁটির চেয়ে শান্তি অনেক ভালো মনে করে সে। যদিও মেয়ের পক্ষেই থাকে সে। মেয়েটাও বাবা অন্ত প্রাণ। সেটাও সানিয়ার পছন্দ নয়। সানিয়াকে খুশি করার জন্য খাবার টেবিলে মাকে ডাকেও না রায়হান। বেশ বুঝতে পারছে রাহেলা, সানিয়ার অপছন্দের তালিকা বেশ বড়ো। প্রধানের মনের ইচ্ছে, তার অভাবে রাহেলা ছেলের কাছেই থাকবে। মেয়ের কাছে নয়। মনে মনে হাসে। ভালোবাসা নিয়ে টানাটানির সংসারে কিছুতেই থাকবে না রাহেলা। সব সময় ওদের মনে হয়, ওরা হেরে যাচ্ছে। ভালোবাসাগুলো নিয়ে নিচ্ছে অন্যে। ভালোবাসা কি এমন কোনো জিনিস যে, মুঠোয় করে নিয়ে যাবে অন্যে? মনের জোর এতো কম থাকলে হয়? গোলাপের গন্ধ একা শুঁকলে যা, দশজনে শুঁকলেও তা। গোলাপ তো দোপাটি হয়ে যায় না। কিছুই যায় আসে না গোলাপের তাতে। মাঝখান থেকে টানাটানিতে ছিঁড়ে যায় ফুল।

এই সব সাত-পাঁচ কথা মনের মধ্যে ঘুরপাক খায় রাহেলার। ভালো লাগে না কিছুই। পর পর দুদিন রান্না পুড়ে গেলো। পোড়া গন্ধে আকুল হয়ে উঠলো সানিয়া। বার বার বললো, সারা বাড়ি দুর্গন্ধে ভরে গেছে। রাহেলা সংকুচিত হয়ে থাকেন। একদিন পোড়ার ধোঁয়ায় ফায়ার এলার্ম বেজে উঠোলো। লজ্জায় কেঁদে ফেলেন রাহেলা। তাঁর মনে হলো, মাটি ফেটে গেলে তিনি লুকিয়ে ফেলতেন নিজেকে। অন্যের কথা আর কী বলবে!

এখানকার বাংলাদেশি পড়শি এলো একদিন বেড়াতে। শিক্ষিত মহিলা। দেশের জন্যে মমতা আছে। খবরাদিও রাখে। দেশে যেতে চেয়েছিলো, কিন্তু ডেঙ্গুর প্রকোপ শুনে যাওয়া বাতিল করেছে। সেই বললো, নগর ভেঙে দুটো হলো, দুজন মেয়র, তবু মশা নিধন হচ্ছে না। চোরেরা মশা মারা ওষুধের বরাদ্দ টাকা নিজেরা খেয়ে পানি ছিঁটাচ্ছে চারদিকে। খাল নালা লেক নর্দমার পানি শুকিয়ে গন্ধ উঠেছে। মশা হবে না তো কি ফুল ফুটবে? সোনার দেশটা দুর্নীতির দুর্গন্ধে ভরে গেছে। মহিলার কথা শুনে হাসে সবাই।

রায়হান বলে, ঠিক বলেছেন ভাবি। উন্নত দেশে একটা খাল বা নালা পেলে, তাকে ঘিরে একটা পার্ক বানায়। আর আমরা পানিকে পচতে দিয়ে মশার কারখানা বানাই। রোগ বালা দুর্গন্ধ সৃষ্টি করি।

সানিয়া সায় দেয়, ঠিক বলেছো। রাহেলা বসে বসে গল্প শোনে। ঝুমি এইসব গল্প পছন্দ করে না। বাংলাদেশেই যেতে চায় না সে। দুইবছর আগে দেশে গিয়ে মশার কামড় খেয়েছে প্রচুর। কথাটা মনে রেখেছে। বলেও, আর কোনো দিন যাবো না বাংলাদেশে। মা-বাবা গেলে একা যাবে। সানিয়া তাতে খুশি। বিদেশি হয়ে উঠছে মেয়ে। বাংলা বলে। কিন্তু লেখতে পড়তে পারে না। ইংরেজি বলে চমৎকার।

ফেরার দিন এসে গেলো রাহেলার। চোখের নদী বয়েই যাচ্ছে তার। আবার কবে দেখা হবে কে জানে? কলিজার ভেতর টনটন করে ওঠে। সাধারণ সৌজন্যের কথাগুলো কেউ পারছেনা কেনো উচ্চারণ করতে? রায়হান একবারও বললো না যে, আবার কবে আসবে মা? কিংবা, বাবাকে নিয়ে এসো একবার। ইস, চিরে চিরে ক্ষরণ হচ্ছে বুকের ভেতর। কাউকেই বলতে পারবেনা কথাগুলো রাহেলা। প্রধানকেও নয়। কষ্টগুলো হয়ে থাকবে বুকের বাসিন্দা। সুখস্মৃতি ছাপিয়ে দুঃখের ঘঁষা ঘঁষা দুর্গন্ধ উঠবে মাঝে মাঝে সেখান থেকে।

একটানা তেরো ঘণ্টা উড়ালের পর শাহজালাল বিমান বন্দরে নামলো রাহেলা। সানিয়া স্যান্ডউইচ করে দিয়েছিলো ট্রানজিটে খাবার জন্যে। প্লেনে এতো খাবার দেয় যে, সেগুলো খাওয়া হয়নি। সত্যি বলতে কি, ইচ্ছেও হয়নি।

বাড়িতে পৌঁছে চাবির ছড়া বের করার জন্য হ্যান্ডব্যাগ খুলতেই কেমন একটা টক টক গন্ধ নাকে লাগে। এলুফোলিও পেপারের আধুনিক সুদৃশ্য সুরক্ষা মোড়ক ভেদ করেই বেরিয়ে এসেছে বদ দুর্গন্ধটা। ইস! পচেই গেছে। খাবারের মোড়কটা হাতে নিতেই ঝপ ঝপ করে ঝরে পড়লো অশ্রু। সানিয়া আর রায়হানের অবহেলা এবং অসম্মানের স্মৃতি খামচে ধরলো তাঁকে মুহূর্তে। দুজনের দুজোড়া হাতের বিশটা ধারালো বিষাক্ত নখ যেনো বসে গেলো কলিজার ভেতর। আহ, ক্ষরণের কি যাতনা! কঁকিয়ে ওঠেন তিনি। উহ, কি ব্যথা, কি কষ্ট! ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন রাহেলা।

প্রধান ভাবলেন, ছেলে, বৌ, পৌত্রীকে ফেলে এসে মন পুড়ছে বৌয়ের।

দুর্নীতির কাহিনি

শিশু কিশোর সদনে জাতীয় পুরস্কার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। সমস্ত জেলা থেকে এসেছে প্রায় দুশো প্রতিযোগী। সাথে তাদের কারো বাবা, কারও বাবা মা দুজনেই, সাথে কারও ছোটো ভাই বোনও। থাকতে হবে আট থেকে দশ দিন। কেউ আত্মীয়ের বাড়ি থাকছে। কেউ কম দামের হোটেলে। কিছু সংখ্যক শিশু কিশোর সদনের তিনতলায় প্রশিক্ষণের ঘরের মেঝেতে। এরা বলে কয়ে লেখালেখির মাধ্যমে অনুমতি নিয়েই আসে যে, সদনেই থাকবে।

রাতে যেমন তেমন, দিনের বেলায় সদনের মাঠ, হল, প্রশিক্ষণের ঘর সর্বত্র শিশু কিশোর বয়সি মানুষের চলাচলে গিজগিজ করে। সারাদিন খাওয়া দাওয়া, প্রশিক্ষণ, কয়েকটা ঘরে প্রতিযোগিতার আয়োজনের কলকাকলিতে মিষ্টি তেতো এক মহা ধুন্দুমার অবস্থা। সদনের তিনতলা ভবনে মোট বাথরুম মাত্র ছয়টা। বাথরুম বিহীন সংস্কৃতির দেশে সদনের অবস্থা বেশ ভালোই বলতে হয়। দৈনিক অফিসের জন্যে বেশ চলে যায়। কিন্তু বছরে একবার এই সময়টাতে মনোহয় বাথরুমের সংখ্যা বিশটা হলেই ভালো হতো। তো প্রায় শ' খানেক লোকের সেখানেই গোসল, সেখানেই অন্য কাজ। টানাটানি ঠেলাঠেলি হলেও বিকল্প নেই। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন আইটেমে বিচারক হয়ে যাঁরা আসেন, পরিচালক তাসকিনা রঞ্জনার ওয়াশরুম আছে তাদের জন্য।

এই বিপুল আয়োজনে পানির খরচ বেড়ে যায়। প্রতিদিন কিনতে হয় কয়েক গাড়ি পানি। তিন ঘণ্টা পর পর বাথরুম ফেনাইল দিয়ে ধোয়ার হুকুম জারি হয় তখন। জুনের শেষ সপ্তায় চরম গরম পড়েছে সেবার। ঝাঁ ঝাঁ রোদে আর ঘামে সবার অবস্থা বেসামাল প্রায়। তবু কাজ বন্ধ রাখার উপায় নেই। ঘামে ভিজে একাউন্টস সেকশনের লোকেরা সারাদিন ভাউচার আর টাকার খাম গোছাতে ব্যস্ত। বিচারকদের অভ্যর্থনা এবং আপ্যায়নের কাজও কম

নয়। এর মধ্যে প্রতিদিন কমপক্ষে দুইবার লোডশেডিং। মরণ দশা হয় সমস্ত পরিবেশের।

তাসকিনা রঞ্জনার এটা চুক্তি ভিত্তিক চাকরি। এই সদনের সাথে নানা কাজে তিনি জড়িত ছিলেন বেশ কয়েক বছর থেকেই। সরকারি চাকরি থেকে পঁচিশ বছর পর ইচ্ছে করে অবসর নিয়েছিলেন লেখালেখি করবেন বলে। সেই কাজই করছিলেন। কিন্তু শিশুদের ওপর লেখা বইটা পুরস্কার পাওয়ার পর থেকে সদনের পরিচালকের পদের জন্য তাসকিনাকে বলা হচ্ছে। প্রথমে এক বছরের চুক্তি। তারপর দেখা যাবে। যাই হোক, রাজী হয় তাসকিনা। মনে মনে ঠিক করেই আসে, এটা তাঁর চাকরি হবে না, হবে সেবাদান। কারও মনোরঞ্জন করতে হবে না। করবেনও না। পরিচালক হিসেবে নিজের ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করবেন। পোষালে থাকবেন, না পোষালে ঘরে ফিরবেন। উপরি লাভ, কিছু অভিজ্ঞতা।

সদনে কিছু চিরকেলে শয়তান ছাড়া বাকিরা ভালো। নিরীহ। সাতে পাঁচে নেই, শুধু বাঁধা চাকরি করে। অনেকে বেশ কাজের, কিন্তু কাজের সুযোগ নেই। গড্ডালিকা নীতির বাইরে করার জো নেই কিছু। পেছনে লেগে যায় লোক। সব বুঝতে পারেন তাসকিনা রঞ্জনা। কিন্তু তবু কিছু ভালো কাজ তাঁকে করতে হবে। গড্ডালিকায় ভেসে সময় কাটাতে তিনি আসেননি। বিশেষ করে সদনের প্রকাশনা বিভাগকে শক্তিশালী করে দেয়ার ইচ্ছে আছে। সেখান থেকে বছরে বারোটা শিশু কিশোরদের বই প্রকাশ করাসহ একটা বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। এই বিষয়ে দুতিনটা মিটিং করার পরই বুঝতে পারেন, প্রকাশনা বিভাগে আরামের ঘরে অসন্তোষের গুঞ্জন। কান দেন না তিনি।

কয়েকজনকে পাশে পেলেন তাসকিনা। তাদের মধ্যে রায়হানা, ডলি, ইকবাল, আতাউর তাদের গুণেই পরিচালকের সব কাজের সহযোগী হয়ে উঠলো। বিশেষ করে জাতীয় পুরস্কার প্রতিযোগিতার জন্যে বাড়তি কাজগুলো দিতে হলো তাদেরকেই। তাসকিনা যতোক্ষণ অফিসে থাকেন, ওরাও থাকে ততক্ষণ। আর থাকে একাউন্টস অফিসার আনোয়ার এবং তাসকিনার পিএস রফিক। কাজের পরিবেশে এমন টিম পাওয়া অনেক বড়ো ভাগ্যের ব্যাপার।

জাতীয় প্রতিযোগিতার কাজ সম্পন্ন করার জন্যে একটা সাময়িক কমিটি করতে হলো। সেখানে রাখতেই হলো ঐ চার রত্নকে। সাথে আরও

কয়েকজনকে। প্রতিদিনের আপ্যায়ন, নির্দিষ্ট অর্থের মধ্যে মানসম্পন্ন পুরস্কার কেনা, সেগুলো i¨vwcs পেপার দিয়ে মোড়ানো, অতিথিসহ প্রতিযোগিদের স্বাস্থ্যগত খোঁজখবর রাখা, ইত্যাদি কাজ করছে ওরা প্রাণ দিয়ে। কোনোদিন ভুলবে না তাসকিনা ওদেরকে। কী কারণে এবং কেমন করে ওরা এত কাছের জন হয়ে গেলো, সেটাও ভাবায় তাকে!

প্রচণ্ড গরমের এক বিকেলে হঠাৎ বোমা ফাটার মতো বিকট এক শব্দ হলো। কিছু না বুঝেই ছোটাছুটি দৌড়াদৌড়ি। সেদিন ছিলো বৃহস্পতিবার। একটু আগেই ছুটি হয়ে গেছে। অফিসারেরা গোছগাছ করছে। কর্মচারিরা প্রায় চলেই গেছে। প্রতিযোগিতায় আসা ভবনভরা গিজ গিজে মানুষ তখনও। আরও তিনদিন থাকবে তারা।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই জানা গেলো, বোমা নয়, পানির পাম্প বার্স্ট করেছে। প্রাণ শুকিয়ে গেলো তাসকিনার। এই দূরন্ত গরমে পানির কী ব্যবস্থা হবে? পানি ছাড়া এতোগুলো মানুষের দূরবস্থার কষ্ট কল্পনাও করা যায় না। আগামী কাল শুক্রবার। তারপর শনিবার। অফিস বন্ধ দুদিন। কিন্তু প্রতিযোগিরা তো থাকবে! থাকবে মানুষের আনাগোনা। তাদের কী হবে?

সঙ্গে সঙ্গে মিটিং ডাকতে হলো। একাউন্টস অফিসার আনোয়ারকে ডাকা হলো। রায়হানা, ডলি, ইকবাল, আতাউর এলো। সমস্যার সমাধান করা যায় কেমন করে, এটাই আলোচনা।

আনোয়ার বললো, কাল পরশু বন্ধ। রবিবারের আগে কিছু করা যাবে না।

-মানে বুঝে বলছেন? বিরক্তি চেপে বলে তাসকিনা।

-হ আপা, বুইজাই বলতাছি। হাসে আনোয়ার।

-এই দুদিন পানি ছাড়া এতোগুলো মানুষ থাকবে কেমন করে, বলেন?

-কি কইতাম আপা?

-কইতে হবে না। করতে হবে। হাসিটা বন্ধ করেন প্লিজ।

-কেমনে করুম আপা? কাজডা করতে টেন্ডার দেওন লাগবো। তারপর টেন্ডার অইলে মালসামান কিনতে অইবো। সুমায় লাগবো।

-টেন্ডার না করে মাল সামান কেনা যায় না? আমি যদি টাকা দিই?

সবাই তাকায় তাসকিনার মুখের দিকে। কথা নেই কারো মুখে।

-আপনে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত নিজ ক্ষমতায় খরচ করতে পারেন। কিন্তু কাজডা করতে আট নয় হাজার টাকা লাগবো। আনোয়ার বলে।

- আগে কখনও করা হয়েছে পাম্পের কাজ?

-অইছে আপা।

-কাজটা যারা করেছে, তাদের চেনেন?

-চিনুম না ক্যান আপা? নবাবপুরের ইসমাইল্যারা আমাদের সব কাজ করে।

-তাহলে তো ভালোই হলো। এখন কাজটা করানোর ব্যবস্থা করেন।

সকলে নড়ে চড়ে বসে। চোখ ভরা বিস্ময়। মুখে কথা নেই কারও।

-কিছু বলেন আনোয়ার। কীভাবে করা যায় কাজটা? তাসকিনা বলে।

-টেন্ডার ছাড়া কাজ অইতো না আপা।

-টেন্ডার বানান।

-ক্যামনে আপা?

-মিছেমিছি, সাজানো টেন্ডার হবে। তিনটে দরপত্র এমন ভাবে করেন যেনো কাজটা হয়ে যায়।

-পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত নাহয় করলাম। তারপর?

-দুটো টেন্ডারের কাগজ পত্র তৈরি করেন। কাজটা করতে হবে।

-আইজক্যা টেন্ডার করার সুমায় কি আর আছেনি আপা?

-কে বলেছে, আজকে ডেটে করবেন? ব্যাক ডেট দিয়ে করবেন।

-দুর্নীতি অইয়া যাইবো আপা। আইনে দরা খাইতে অইবো।

-আমি আজ দুর্নীতিই করবো। মানি না আইন। মানুষের জীবনের চাইতে আইন বড়ো হতে পারে না। নিঃশব্দ ঘর।

-রায়হানা, ডলি, ইকবাল, আতাউর, তোমরা আছো তো আমার সাথে?

হই হই করে ওঠে সবাই। এতোক্ষণে বুঝেছে ওরা যে, তাসকিনা রঞ্জনা পানির পাম্পটা মেরামত করেই বাড়ি যাবেন।

তখনই ব্যাক ডেট দিয়ে টেন্ডার কর্মটি করা হলো। ব্যাক ডেট দিয়ে বানানো হলো দুটো দরপত্র, মানে ছয়টা দরপত্র। একটা চার হাজার সাতশো টাকার কাজ, একটা তিন হাজার টাকার। সাজিয়ে গুছিয়ে নিম্নতমো দরপত্র বাছাই করে সই সাবুদসহ পাস করা হলো দরপত্র। তখনই ছুটতে হলো সদনের গাড়ি নিয়ে আতাউর, ইকবাল আর আনোয়ারকে নবাবপুরে মাল সামান কিনতে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে মিস্ত্রী, মাল সামান, কিছু প্যাকেট খাবার নিয়ে অফিসারেরা ফিরে এলো। পানির হাহাকার জানিয়ে লোকজন কয়েকবার পরিচালকের ঘরে এলো। সন্ধের আগ দিয়ে শুরু হলো লোড শেডিং। কয়েকটা মোমবাতি জ্বালালো দারোয়ানেরা। পানি নেই, আলো নেই। সন্ধে বেলার কামড়ানো গরম। ছেলেমেয়ে অভিভাবকদের নিরন্তর চলাফেরা। কেমন যেনো ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করলো। মোমের আলোয় আবছা আঁধারে বসে মিস্ত্রিদের কাজের ধাতব কর্কশ শব্দ আরও নির্দয় করে তুলছিলো পরিবেশকে।

দুঘণ্টা একটানা কাজ করে মেরামত হলো পাম্প। শুরু হয়ে গেলো পানি ওঠানো। কাকতালীয়ভাবে বিদ্যুতও চলে এলো। পানির পাম্পের শব্দকে এড়িয়ে আলোর হাসি ছড়িয়ে পড়লো সদনের সর্বত্র।

আবার সবাই বসলো পরিচালকের ঘরে। রফিকই উৎসাহের চোটে খাবার নিয়ে এলো। চা এলো ক্যান্টিন থেকে। রাত তখন সাড়ে নটা। গাঢ় হয়েছে সন্ধে। বুক চাপাভাব দূর হয়ে গেছে সকলের। হাসি সকলের মুখে। তাসকিনার মুখেও প্রসন্ন হাসি। আনোয়ার বলে,

হিম্মত আছে আপনার আপা। গলা ঝেড়ে কষ্ট করে হাসে ও।

-সব সৎ কাজে হিম্মত লাগে আনোয়ার।

-আমরা বুঝতেই পারছিলামনা, কি করতে চাইছেন আপনি ম্যাম। আতাউর বলে।

-তোমাদের চোখের সামনে বসে একটা বেআইনি কাজের সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলাম। তাসকিনা নির্বিকারে বলে।

-পারেনও বটে ম্যাডাম। রায়হানা বলে।

-সতিই তাই ম্যাম। দুপাশে মাথা ঝাঁকিয়ে প্রসন্ন হাসিতে মুখ ভরিয়ে ইকবাল বলে, জীবনে এমন কাজ দেখিনি ম্যাম।

-পদাধিকারে যা পারা যায় না, ভালো কাজের জন্য কিছু দুর্নীতি করলে তা পারা যায়। শুধু আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে, মন্দ ধান্দা নিয়ে কাজটা করা হচ্ছে না।

-তবু কাজডা কেমন কেমন আপা, আনোয়ার বলে, টাকা পয়সার ব্যাপার বড়ো খারাপ আপা। কে কখন কারে দুষে বলা যায় না।

তাসকিনা হাসে। ছোটো অন্তর হলে যা হয়। কিন্তু চটে গেলো অফিসারেরা।

রায়হানা বলে, কি বলতে চান আপনি?

-কি আর বলবে রায়হানা? এখন তো সবচেয়ে বড়ো দুর্নীতির নায়ক আনোয়ারই। তাসকিনা উচ্চারণ করে। কারণ, সব তার ফাইল থেকেই হয়েছে। অস্বীকার তো করতে পারবে না।

ভয়ে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেলো আনোয়ার। কথা আটকে গেলো তার গলায়। ফ্যাকাসে হয়ে গেলো মুখ। মনে হলো পড়ে যাবে সে।

-বসেন, বসেন আনোয়ার।

-আমারে ফাসাইয়েন না আফা। আমিও ছুটু মানুষ।

- কাজটা তো করেছেন। কই ভয়ানক দুর্নীতির ব্যাপার।

- আফা, আফা, কি কইতাসেন আফা?

- কেউ যদি মন্ত্রণালয়ে বলে দেয়?

-এমুন কইরা আমার চাক্রিডা খাওনের ব্যবস্থা করলেন আফা?

- কী পাগলের মতো কথা বলছেন? বসেন চেয়ারে। নাটক করলাম এক্টু। তাসকিনা হেসে বলে, আরে ভাই, সকলেই জানে, অনিয়ম বলেন দুর্নীতি বলেন, আমিই করেছি। আপনি কেনো ভয় পাচ্ছেন? এটাও ঠিক, প্রয়োজন হলে এইরকম দুর্নীতি আমি আরও করবো এবং এই খাতায় লেখেই করবো। আপনারা যতো পারেন নিন্দা করবেন। মজার ব্যাপার হলো, আপনারা নিন্দা করে, দুর্নীতির সত্য কাহিনি বলেও শান্তি পাবেন না। অন্যদিকে, নিন্দামন্দের কাহিনি শুনেও আমি থাকবো শঙ্কাহীন।

উত্তম পরিবেশে সাফল্যের সাথে জাতীয় পুরস্কার প্রতিযোগিতা শেষ হলো। বারোটা শিশু কিশোর উপন্যাস প্রকাশিত হলো। বার্ষিক পত্রিকার সবকাজ শেষ। শিশুদের আঁকা ছবি থেকে বাছাই করে এই প্রথম প্রচ্ছদ করা হয়েছে। নামি দামি শিল্পীদের পেছনে ছুটতে হলো না। বেঁচে গেলো কিছু টাকাও।

এক বছর কতোই আর সময়! শেষের মাসে, ইউনিসেফ থেকে কিছু বই উপহার দিয়েছিল শিশু সদনে। সেখানে আদিবাসী মেয়েদের ছবিতে ভর্তি। কিছু কিছু ছবিতে দেশের সংস্কৃতি পরিপন্থী ছবি। উদোম গায়ে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে মা। কী পড়বে, কী শিখবে শিশুরা, তাই বুঝতে পারলো না তাসকিনা। ইউনিসেফ মিটিং চেয়েছে। সেখানে সদনের অভিমত প্রয়োজন। মিটিং-এ মতান্তর হলো। তার মত হলো, দেশের গ্রামীণ সমাজে দারিদ্র থাকতে পারে, তাই বলে উলঙ্গ বাচ্চা সামনে থেকে দেখাতে হবে? মায়ের উদোম গা দেখাতে হবে? ছেলে, বুড়ো, মসজিদের ইমাম, পর্দানশিন মহিলা, সবাই দেখবে এই ছবি? বিদেশিরা দেখবে। বিশ্ব দেখবে বাংলাদেশের এমন ভাবমূর্তি! মানতে পারেনি তাসকিনা।

ফেরত গেলো ইউনিসেফের বই। একটা ট্যুর প্রোগ্রাম ছিলো জাপানে। বর্জিত হলো তাসকিনা। শুধু তাই নয়, একটা পুরস্কারের কথা ছিলো, সেটাও বাতিল হলো। বিদেশিরা বাঙলাদেশে এসে রাজার হালে থাকে। তাদের কাজের সমালোচনা করলে সহ্য করতে পারে না। প্রতিশোধ নেয়।

তবু সফল একটা বছর কেটেছে শিশু সদনে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছিলো সে। তা পেরেছে। ইচ্ছে ছিলো, আর এক টার্ম কাজ করার।

দুর্নীতির অভিযোগে চুক্তির নবায়ন হলো না তাসকিনা রঞ্জনার।

জোছনার মতো ভালোবাসা

দরজায় টুক টুক করে দুটো শব্দ। মানে, কেউ আসবে ঘরে। বললাম, ভেতরে আসেন। সালোয়ার কামিজ আর মাথায় ওড়না দিয়ে এক মহিলা এসে দাঁড়ালো।

-সালামালেকুম। আমি কুবরা।

-ও হ্যাঁ, সিস্টার বলেছিলো আপনার কথা।

সকালেই সিস্টার বলেছিলো, একজন পাকিস্তানি রোগী আছে আমাদের ক্লিনিকে। তুমি বাংলাদেশি শুনে সে দেখা করতে চায়। তুমি কি কথা বলবে?

মনে মনে ভেবেছিলো রাহেলা, এটা কেমন সংকোচ? সেকি মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানিদের নৃশংস হত্যাযজ্ঞের কথা মনে রেখেই এই সংকোচ বোধ করছে? বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক এখনও ভালো না। রক্তের দাগ মোছেনি এখনও। বয়সি মানুষদের বুকের ভেতর ঘা থকথক করে। এমন কোনো পরিবার ছিলো না যারা মুক্তিযুদ্ধের আঁচ পায়নি।

সিস্টারকে বলেছিলো, দেখা করবো ওঁর সাথে। আজই বলে দিও কথাটা।

এই তাহলে সেই পাকিস্তানি রোগী? সালামের উত্তর দিয়ে বলে রাহেলা, বসেন।

ঘরে দুটো চেয়ার। আমার বিছানার সাথে লাগানো হাতওয়ালা একটা চেয়ার। আর ব্যালকনির দরজার দিকে একটা। ওতে হাতল নেই।

চেয়ারটা বিছানার কাছে টেনে এনে বসলো মহিলা। ও কথা শুরুই করলো উর্দুতে। ওর ধারণা বাংলাদেশিরা সবাই উর্দু জানে। শুধু ও নয়, এখানকার

কয়েকজন পাকিস্তানিকে দেখেছে রাহেলা। সবারই ধারণা, বাংলাদেশের মানুষেরা সকলেই উর্দু জানে। কী অর্বাচীন!

রাহেলা বলে, উর্দু আমি জানি না। ইংরেজিতে কথা বলি?

-আমি ইংরেজি জানি না। তাহলে জার্মান ভাষায় কথা বলি?

-ওটাও আমি খুব কম জানি। মানে, যতটুকু বুঝি, তার অর্ধেকও বলতে পারি না।

রাহেলা হিপ রিপ্লেসমেন্ট করে আট দিনের দিন এই রিহ্যাব ক্লিনিকে এসেছে। পুরো নাম, 'হেলিয়স রেহা ক্লিনিক'। রেহা হলো, রিহাবিলিটেশন। এই অপারেশনের পর তিন থেকে চার সপ্তা ফিজিও থেরাপি নিতে হয়। বাল্টিক সাগরের একেবারে কোলে 'ডাম' শহর। এখানে গড়ে উঠেছে চমৎকার আধুনিক দরদালান। তার মধ্যে এই রেহা ক্লিনিকের দশ তলা ভবন। উত্তর জার্মানির এই শহর পর্যটনের জন্য খ্যাত।

প্রতিটা ঘরের সাথে তিনকোণা ব্যালকনি। দাঁড়ালে সাগরের দিগন্ত বিস্তারি থই থই জলরাশির উচ্ছ্বাস দেখা যায়। তীরে ছোটো ছোটো নৌকো বুকের ওপর উদ্ধত মাস্তুল নিয়ে অপেক্ষা করে পর্যটকদের জন্য। মানুষ আসবে, পাল উড়িয়ে নৌকো নিয়ে ঢেউ ভেঙে ভেঙে নেচে বেড়াবে সেই আশায়।

গম গম করা পর্যটক নেই, তবে কিছু মানুষের আনাগোনা সব সময় থাকে। এদেশে তো মানুষের চেয়ে মানুষের জীবনের উপকরণ অনেক বেশি। তাই অলস প্রহর গোনে নৌকোগুলো। হতো কক্সেসবাজার, তাহলে এতোগুলো নৌকোর একটাও বসে থাকতো না। গিজ গিজে প্রমোদবিহারি মানুষেরা কাড়াকাড়ি করতো নৌকো নিয়ে। আর ব্যবস্থাপনারও ব্যাপার আছে। সেটা তো বলতেই হবে। সব কিছুই এতো নিয়মতান্ত্রিক, যেনো মেশিন। এদিক ওদিক হওয়ার যো নেই।

দুই পা টান টান করে শুয়ে আছে রাহেলা। একটু একটু করে গল্প শুরু হলো জার্মান আর উর্দু ভাষার মিশ্রণে। সে এক আজব কম্বিনেশন। তবু ভাবের আদান প্রদানে খুব একটা অসুবিধে হলো না। মহিলার নাম কুবরা। জানতে চাইলো রাহেলা, মানে কী?

- জানি না।

- পাকিস্তানের কোথায় ঘর?

- লাহোর। তবে লাহোর থেকে ছয় ঘণ্টা বাসে যেতে হয়। পথ ভালো।

- দেশে কে কে আছে?

- বাবা-মা, ভাই-বোন সবাই আছে।

ভাষার মিশ্রণের কারণেই হয়তো সম্বোধনের 'আপনি' নেমে এলো 'তুমি'তে। রাহেলা প্রশ্ন করে, তুমি জার্মানিতে এলে কী করে?

- আমার স্বামীর সাথে এসেছি।

- স্বামী কী করে?

- আগে কাজ করতো। এখন করে না।

- মানে?

- এখন শুধু মদ খায়। নির্বিকার ভাষ্য কুবরার।

- সংসার চলে কী করে?

- আমি কিচেনে কাজ করি।

লক্ষ্য করলো রাহেলা, কুবরা বেশ সুঠাম স্বাস্থ্যের মেয়ে। বাংলাদেশের অনেক অনেক ছেলে এদেশের কিচেনে কাজ করে। কিন্তু কোনো মেয়ের কথা জানে না রাহেলা। শক্ত কাজ।

- তাতে সংসার চলে যায়? তোমার স্বামীর মদের পয়সাও হয়ে যায়?

- না, ও সরকারি সাহায্য পায়।

- ছেলে মেয়ে কয়টা?

- দুই ছেলে, এক মেয়ে। মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। দুই ছেলে লেখাপড়া করছে।

- কতোদিন আছো জার্মানিতে?

- ছাব্বিশ বছর।

- জার্মান ভাষা বেশ ভালো শিখেছো তো।

- হ্যাঁ, লেখাপড়া তো শিখিনি। এখানে এসে এই ভাষাটা শুনে শুনে শিখেছি।

- দেশে লেখাপড়া করোনি কেনো?

- আমার বাবা গরিব ছিলো। ভাইদের স্কুলে পাঠিয়েছিলো। মেয়েদেরকে পারেনি।

একবিংশ শতাব্দিতে এমন কথা শুনতে খুব কষ্ট হয়। এই উপমহাদেশে এখনও নারী পুরুষের এমন বৈশম্য দিব্যি চালু আছে। নিরবে তা মেনে নেয় মেয়েরা। রাহেলা ভালো করে কুবরার মুখের দিকে তাকায়। কী কমনীয়

আর মিষ্টি মুখখানা! এই চেহারের গুণেই হয়তো কোনো এক ভাগ্যান্বেষী যুবকের সাথে বিয়ে হয়েছিলো। বেঁচে গেছে না দহে পড়েছে, বলা যায় না! তবে কুবরাকে খুশিই মনে হয়।

কুবরা বলে, তোমার ডান পা বেশ ফুলে আছে।

- এখন একটু কম মনে হয়। আরো ফুলেছিলো।

- আমি একটু দাবিয়ে দিই?

- সে কী কথা কুবরা? হাঁ হাঁ করে ওঠে রাহেলা। বলে, আমার পা দাবিয়ে দেবে কেন তুমি? কি করে তা হয়?

- আমি তো তোমার মেয়ে হতে পারতাম মা জি।

এ কি শব্দ উচ্চারণ করলো পাকিস্তানি মেয়ে কুবরা? দুচোখ ভাসিয়ে অশ্রু গড়াতে লাগলো রাহেলার। কোথায় বাংলাদেশ, কোথায় পাকিস্তান আর কোথায় জার্মানি? গল্প উপন্যাসে পড়েছে, মন দিয়ে মন ছুঁতে জানলে পৃথিবী তোলপাড় হয়ে যায়। মানচিত্রের সীমারেখা ভেঙে মানুষ এক অবস্তুর আবহে দাঁড়ায় এসে। যেখানে শুধু হৃদয়গুলো ফুটে থাকে তাদের সমস্ত সুকুমার শোভা আর অনুপম গন্ধ নিয়ে।

- মা জি, কাঁদছো কেন? কষ্ট হচ্ছে?

- বড়ো ব্যথা কুবরা। খুব কষ্ট।

- আমি তো দেখতেই পাচ্ছি। আমারও তো মেরুদণ্ডের হাড়ে অপারেশন হয়েছিলো। আমি জানি কষ্ট কতোটা হয়।

- তুমি কেমন আছো এখন?

- অনেক ভালো।

- কতোদিন হলো এখানে আছো?

- চার সপ্তা হলো। আগামী সপ্তায় ঘর যাবো। আর কথা নয়, মা জি। তোমার বডি মিল্ক কোথায় আছে বলো? এবার একটু কাজ করি।

- বাথরুমে।

রাহেলা প্রাণান্ত ব্যথায় কাহিল হয়েছিলো। দৈনিক আটটা নোভালজিন খেয়েও তেমন একটা কমছে না ব্যথার তোড়। ডাক্তার বলেছেন, চাইলে আরো খেতে পারে রাহেলা। কিন্তু সে চায় না। এতেই পেটে ব্যথা শুরু হয়েছে। সে আর এক জ্বালা। হয়তো ভালো লাগবে মালিশ করে দিলে। কিন্তু পায়ে মালিশ নেয়ার সংকোচটাও লজ্জা দিচ্ছে। এমন অলৌকিকভাবে এই সেবা নেমে আসবে তার ঘরে, তা সে ভাবতেই পারেনি। একটু আরামের লোভে আর বাধা দেয় না। লোভের কাছে মানুষ কতো সহজে হেরে যায়।

কুবরা বাথরুম থেকে ডাভ বডি লোশন আনলো। চেয়ার টেনে বিছানার কাছে এলো। তারপর চেয়ারে রাখা ছোটো তোয়ালে বিছানার চাদরের ওপর বিছিয়ে তার ওপরে রাখলো রাহেলার ডান পা। এবার সত্যি মায়ের মতো মমতায় নরম করে মালিশ করতে লাগলো কুবরা। যেনো কতো কালের চেনা মানুষ। কতো মায়ার সম্পর্ক তার সাথে। কী আশ্চর্য ঘটনা! অথচ ওর সাথে দেখা করার আগে ভেবেছিলো, মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনির নিন্দা করবে। বলবে, পাকিস্তানিদেরকে আমরা কোনোদিন আপন ভাবতে পারবো না। তারা আমাদের জানের দুশমন হয়েই থাকবে। রাজনৈতিকভাবে যেমনই হোক সম্পর্ক বা বানিজ্যিক সম্পর্ক যেমনই হোক, আমাদের জীবনে যে দুর্যোগ এনেছিলো যুদ্ধ, তা আমরা উলুখাগড়ারা ভুলবো না। মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসে বঙ্গবন্ধু যতোই ভুট্টোর সাথে বন্ধুসুলভ ব্যবহার করুন, যতোই উদারতা দেখান। দেশের সাধারণ মানুষ কোনোদিন বন্ধু হবে না পাকিস্তানের।

কুবরা পা মালিশ করছে। কী অসাধারণ আরাম লাগছে! সাজানো কথাগুলো আস্তে আস্তে হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে রাহেলার। সত্যি তো, একাত্তরের যুদ্ধে যাই হোক, কুবরা তো তার অংশীদার নয়। হয়তো সে তখন একেবারেই শিশু। হয়তো সে জানেই না যুদ্ধের কথা। আবার চোখে নামে নিরব অশ্রুর বান। এই মেয়ে পাকিস্তানি, কে বলবে? তাকে 'মা' ডেকেছে। মেয়ের মতো সেবা করছে। কেমন করে ঘটছে এটা? এই মেয়ে মদ্যপ স্বামী নিয়ে বেঁচে আছে এই প্রচণ্ড পরদেশে। তিন ছেলে-মেয়ে মানুষ করেছে। ভাষা শিখেছে নিজের চেষ্টায়। কাজ করে কিচেনে। ছেলেরাই যেখানে পরিশ্রান্ত হয়ে ওঠে। কুবরা বলেছে, বাচ্চারা ওর খুব ন্যাওটা। হবেই তো! এমন মায়াবতি মাকে ভালোবাসবেই তো বাচ্চারা।

আবার হারিয়ে যায় মানবিক ভালো মানুষ। মনে হয় কুবরার হাত দিয়ে সারা পাকিস্তান বুঝি বাংলাদেশি রাহেলার পা ধরে মাফ চাইছে। এই মুহূর্তে কেউ

তারা মানুষ নয়, মানচিত্র। দুটি স্বাধীন দেশের প্রতীক। একদিকে বাংলাদেশ আর অন্যদিকে পাকিস্তান। আবার ঘুরে দাঁড়ায় মন। না না ওসব কিছুই না। এই মুহূর্তে দুটি মানুষের মধ্যে বিনিময় হচ্ছে নিঃসার্থ ভালোবাসার। এ আর এক রকম পৃথিবী। হঠাৎ করেই দেখা দেয় মানুষের জীবনে।

- এবার রাখো কুবরা। খুব আরাম পেলাম।

- বলেছিলাম না মা জি, দাবিয়ে দিলে ভালো লাগবে।

- তোমাকে ধন্যবাদ দেবো না কুবরা। ভালোবাসা দেবো। আর কী বলি বলো তো?

- কিছু বলতে হবে না মা জি। হ্যাঁ, তোমার কোনো ছোটো কাপড়, মানে আন্ডার উইয়ার টিয়ার থাকলে কাল এসে ধুয়ে দেবো।

- না না কুবরা, আমার কোনো কিছু নেই ধোয়ার।

- ঠিক আছে, আমি কাল আসবো আবার।

বিস্ময়ের শেষ নেই রাহেলার। কবি এমনি বলেননি,

‘সবচেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে
যার কোনো পরিমাপ নেই বাহিরের দেশে কালে
সে অন্তরময়
অন্তর মেশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।’

রবীন্দ্রনাথ বহু দেশ ঘুরেছেন। বহু মানুষের সান্নিধ্য পেয়েছেন। বহু মনকে তিনি ছুঁয়েছেন। বহু মন তাঁকে ছুঁয়েছে। তাই তো তিনি এমন করে বুঝেছিলেন যে, কারো মনের কাছাকাছি আসার জন্য দেশ কালের মাপ কোনো হিসেব নয়। দুটি হৃদপদ্ম যখন পরস্পরকে দেখা মাত্র ফুটে ওঠে পরম আনন্দে, তখন সেই ওপরের মহাজনও অপার তৃপ্তিতে হাসেন। ভাবেন, তাঁর দাবা খেলায় আকস্মিক কিস্তিমাত না হলে মজা কোথায়?

পরদিনও এলো কুবরা। ছোটো একটা বাটিতে আপেল, নাশপাতি আর আলু বোখারা কেটে নিয়ে এসেছে। বললো, তার ছেলে এসেছিলো দেখতে। ‘কিল’ শহর থেকে ‘ডাম’ দুই ঘণ্টার পথ ট্রেনে। প্রতি সপ্তায় দুই ছেলেই পালা করে আসে। বড়ো ছেলে এনেছে ফলগুলো। তারই ভাগ রাহেলাকে দিতে চায় কুবরা।

খুব সমাদর করে নেয় রাহেলা ফলগুলো। ওর সামনেই খায় দুই এক টুকরা ফল। খুশিতে ঝলমল করে ওঠে কুবরার চোখ মুখ।

- তোমার দেশেও তো খুব ফল হয়, তাই না বিটিয়া? মুখ ফস্কে বেরিয়ে এলো শব্দটা।

অবাক হয় না কুবরা। যেনো এই সম্বোধনেই আমি ওকে ডেকে থাকি। একটু হেসে বললো,

হ্যাঁ, আমাদের নিজেদেরই ফলবাগান আছে।

- আমাদের দেশে এই সব ফল হয় না।

- তাই নাকি? কেনো?

- মাটি আর আবহাওয়ার ব্যাপার কুবরা। তবে আমি যখন জার্মানিতে আসি, তখন এসব ফল খুব খাই। ভালোবেসে খাই।

- এখন যাই মা জি, আমি কাল আবার আনবো।

- না না, ঐ তো দেখছো টেবিলের ওপর আপেল জমে গেছে।

- খাওনি কেনো?

- শরীরটা বড়ো খারাপ। এতো ব্যথা যে খাওয়া দাওয়া ভালো লাগছে না। আমার জীবনে অনেক অপারেশন হয়েছে। কিন্তু হিপ রিপ্লেসমেন্ট-এর মতো দারুণ ব্যথাপূর্ণ অপারেশন আর হয়নি। বড্ড কষ্ট যাচ্ছে।

- দুই সপ্তা পর থেকে একটু একটু করে কমবে মা জি। নাও শুয়ে পড়ো পা লম্বা করে। একটু দাবিয়ে দিয়েই যাই।

সচ্ছন্দ সমর্পনে রাহেলা কুবরার কথা মতো পা মেলে শুয়ে পড়ে। কুবরার মমতার হাতের মালিশে আজও আরাম পেলো রাহেলা। ইচ্ছে হলো, এই প্রবাসে নির্জনে মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করে। ডাম শহরের রেহা ক্লিনিকে একজন পাকিস্তানি মেয়ের এমন নিখাঁদ ভালোবাসা অপেক্ষা করছিলো তার জন্য, এ যেনো স্বপ্নেরও অতীত। সবই ঐ মহাজনের কারসাজি। কার জন্য কোথায় কী সাজিয়ে রাখেন তিনি, কেউ জানতে পারে না।

পরদিন সন্ধেবেলা কুবরা এলো না। কী অস্থিরতা রাহেলার! কী হতে পারে মেয়েটার? কেমন একটা প্রতীক্ষা জন্মে গেছে। মনে হয়, এই বুঝি এলো। এই বুঝি এলো। খাঁ খাঁ করতে লাগলো সন্ধেটা।

অবশেষে ঘর থেকে ফোন করলো রাহেলা। কুবরা জানালো, আজ তবিয়ত ভালো নেই মা জি। মেডিসিন উডিসিন নিয়ে শুয়ে পড়েছি। তবে আমার গলতি হয়েছে, তোমাকে জানানো উচিত ছিলো যে, আজ আমি আসতে পারছি না।

-কি যে বলো কুবরা, এতে গলতি কোথায়? তোমার কথা ভাবছিলাম কিনা, তাই ফোন দিয়েছি। ভালো থেকো। বিশ্রাম নাও।

তারপর দিন দুপুরের দিকে কুবরা আবার হাতে একটা বাটি নিয়ে এলো। ছোটো ছেলে এসেছে কিল থেকে। সেখানকার প্রতিবেশি ছেলের হাতে বাঁশমতি চালের মটরশুঁটি পোলাও পাঠিয়েছে কুবরার জন্য। সাথে পুদিনা পাতার চাটনি। বললো, মাজি, তোমার জন্য সামান্য একটু পোলাও এনেছি।

কুবরার হাত ধরে কাছে বসালো রাহেলা। বললো, এতো দূর থেকে তোমার ছেলে খাবার এনেছে তোমার জন্যে। সেখান থেকে আমাকে কেন দিচ্ছো বিটিয়া?

- তোমাকে দেখেই মা মেনেছি। সামান্য খাবারই তো। তোমাকে একটু না দিয়ে খাই কেমন করে? খেয়ে দেখো ভালো লাগবে।

- তোমাকে তো আমি কিছু দিতে পারছি না। বিশেষ করে তোমার ছেলের জন্য কিছু দিতে ইচ্ছে করছে।

-আমার ছেলের জন্য কিছু দিতে হবে না। তবে তোমার যদি কিছু কিনতে হয়, তাহলে বলো আমাকে। নিচে দোকান আছে। টুক টাক জিনিস কেনা যায়।

- আজ নয়। তবে ঐ যে বিস্কুটের প্যাকেট আছে ওটা নিয়ে যাও তোমার ছেলের জন্য।

- তুমি খাবে কী?

- অন্য ভাঙা প্যাকেটে আছে কিছু। তাছাড়া খেতেই তো পারি না কিছু।

বেশি সাধাসাধি নেই। লক্ষ্মী মেয়ের মতো প্যাকেটটা নিলো কুবরা। রাহেলা জানতে চাইলো, তোমার ছেলে কি চলে যাবে আজই?

- না। আমি ডাক্তারের সাথে কথা বলেছি, ও আজ আমার সাথে থাকবে। হাসলো একটু।

- বিছানা বড়ই ছোটো না?

কুবরা হেসে বলে, আমার বাচ্চারা আমার সাথে ঘুমাতে খুবই পছন্দ করে। মেয়ে বিয়ে হয়ে দুবাইতে চলে যাওয়ার পর থেকে এই ছেলে আমার কছে শোয়। হয়ে যাবে আমাদের। তুমি চাউলটা খেয়ে নিও। চাটনিটা তিখট, মানে ঝাল কিন্তু। আমি আসবো সন্ধে বেলায়।

- আজ আর এসো না বিটিয়া। ছেলেকে সময় দাও।

হাসপাতালে রুটিন মাফিক খাওয়া। সকাল আটটায় নাশতা, সাড়ে এগারোটায় লাঞ্চ, সাড়ে পাঁচটায় ডিনার। এদেশে সকাল আর সন্ধেতে ঠাণ্ডা খাবার। মানে, রুটি, মাখন, মার্মালেড, চিজ, দই, ফল এইসব। রান্না করা ঠাণ্ডা খাবার নয়, যথার্থ অর্থেই ঠাণ্ডা। দুপুরে লাঞ্চটা গরম। খাবার দিয়ে গেছে। উঠি উঠি করে শুয়েই ছিলো রাহেলা। কারণ এরই মধ্যে জেনে গেছে সে, কী রকম খাবার দিতে পারে লাঞ্চে।

ক্রাচটা নিয়ে বাথরুমে গেলো। দুঃসহ ব্যথা আর সারা শরীরে কেমন বিশ্রি কষ্ট। মাথা ঝিম ঝিম করছে। বাথরুম থেকে এসে আবার শুয়ে পড়লো রাহেলা। সারাদিনে ২৭/২৮টা বড়ি খেতে হচ্ছে। সাথে কিছু খাবার নাহলে তো চলবে না। সকালের খাবার একটু খেতে পারে সে। বাকি দুবার কিছুই খেতে পারে না বলতে গেলে। ফলে পেটে মোচড়ানো ব্যথা হচ্ছে কদিন থেকে। তেতো হয়ে থাকে মুখ। মনে জোর এনে উঠে পড়লো রাহেলা।

লাঞ্চে আছে সবজি সেদ্ধ, টমেটোর সসে ডোবানো বেবি টার্কির মাংস আর ম্যাশ পটেটো। খাবার ভালো। সাস্থ্যকর। লবণ খুবই কম। কোনো মশলা তো নেইই, লবণও নেই। রাহেলা চেয়ে নিয়েছে লবণ আর গোলমরিচের কুটি কুটি প্যাকেট। বাংলাদেশের মানুষেরা নাকি ভোজন বিলাসী। হয়তো হবে। কুবরার চাউল দেখে মনে হলো, পোলাও খেতে পারে এমন মানুষেরা কোনোদিন শুধু পুদিনার চাটনি দিয়ে তা খাবে না। সাথে কমপক্ষে কাবাব চাই।

কিছুতেই গিলতে পারলো না সে খাবার। দুই তিন চামচ সবজি আর দু টুকরো টার্কির মাংস নিয়ে অনেক চিবিয়ে গিলে ফেললো। ডেসার্ট তবু চলে। গায়ের জোরে খেয়ে নিলো। তারপর ওষুধ। বিশ্রাম নিতে গিয়ে বমি চলে আসে। উঠে বসে বিছানায়। সুইচ টিপে মাথার দিকে অনেকটা উঁচু করে বিছানা। কিছুক্ষণ বসে থাকে মাথা উঁচু করে।

ঘড়ি তো চলেই না। দুপুর দাঁড়িয়ে থাকে নিষ্ঠুর প্রহরীর মতো। কাঁচের খোলা জানালায় সাগরের প্রতিফলন দেখা যায়। কী নিশ্চিন্তে দুলছে, নাচছে, ছিটকে উঠছে। এক ঢেউ ভাঙার আগেই আর এক ঢেউ এসে উপচে পড়ছে তার ওপর। সাগরের জলের শব্দ কোনোদিনই তার কাছে কান্না বা বেদনার শব্দের মতো লাগেনি। মনে হয়েছে জলের সাথে জলরমনের শীৎকার। কী আনন্দে নিরন্তর নিরবধি জলরমনে মেতে আছে সাগর! তবে তো পৃথিবীতে এতো প্রাণের জন্ম হয়েছে এবং হচ্ছে।

শত শত গাঙচিল সাদা-ধূসর পাখা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে। ডাকাডাকি তো আছেই। ভাঙা ভাঙা গলার স্বর। সাগর তো আরো দেখেছে রাহেলা। গাঙচিলের ডাক ভালো লাগেনি কোনোদিন। আজ এই নির্জন দুপুরে মনে হলো, বেশ লাগছে তো। ক্লিনিকের গা ঘেঁষা গাছে গাছে ঘুঘু ডাকে। বেশ বড়ো ঘুঘুগুলো। দেশের কবুতরের চেয়েও বড়ো।

সেকেন্ড মিনিটের কাঁটা গুনতে গুনতে ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা বাজলো। আবার ঠাণ্ডা খাবার এলো। গমের আটার পাউরুটির একটা টুকরো, মার্মালেড, এক স্লাইস চিজ, এক কিউব মাখন, এক কিউব মার্জারিন, আর সালাদ। অবশ্য রুটি তিন চার স্লাইস পাওয়া যায়। চাইলেই হলো। কিন্তু রাহেলাই খেতে পারে না। ব্রাউন পাউরুটিও মনে হয় রবার। চিবোলে নরম হতে চায় না। ভাবলো, আজ কুবরার চাউলটা খাবে।

কোনো মতে একটু রুটি খেয়ে ডেসার্ট নিয়ে বসলো রাহেলা। ভাবলো, আগে পোলাও খেয়ে নেয়া যাক। পুদিনার চাটনি দিয়ে এক গ্রাস পোলাও মুখে দিলো। ওরেব্বাবা! এ কী প্রাণঘাতী ঝাল? বিশম উঠে গেলো। অসম্ভব। এই পোলাও খাওয়া যাবে না। তাড়াতাড়ি ডেসার্ট খেতে শুরু করলো। সে কী জিবের জলুনি থামে?

আবার প্রহর গোনা। সন্ধে বেলায় কুবরা আসবে। ওকে কিছু উপহার দিতে মন চাইছে রাহেলার। কিন্তু কি দিতে পারে? সাথে শাড়ি আছে। এখনো

পরতে পারেনি। শরীর একটু ভালো হলে পরবে। ওখান থেকে একটা সিল্কের শাড়ি দেয়া যায়। শাড়ি তো সবাই ভালোবাসে। হয়তো কুবরাও বাসবে। নিশ্চয় বাসবে। একটা শাড়ি আলাদা করে রাখলো কুবরাকে দেয়ার জন্য। আজই সন্ধেবেলায় দেবে।

সন্ধে নেমে এলো। রাহেলার শরীর বেশ খারাপ লাগছে। নার্স এসে ব্লাড প্রেসার দেখে বললো, ডাক্তারের সাথে কথা বলতে হবে। ডাক্তার এলেন। প্রেসার দেখলেন। চিন্তিত হয়ে পড়লেন খুব। এমন পেশেন্টকে রেহা-তে রাখা ঠিক হবে না। এই ক্লিনিকের সহযোগী ক্লিনিক আছে বিশ কিলোমিটার দূরে। সেটা বড়ো হাসপাতাল। ওদের ডাক্তার যন্ত্রপাতি অনেক উন্নত।

আধ ঘণ্টার মধ্যে রাহেলাকে ঐ হাসপাতালে পাঠানোর সব ব্যবস্থা হয়ে গেলো। ডাক্তার এবং নার্সরা দেয়াল আলমারি খুলে একটা ব্যাগে কিছু জিনিসপত্র ভরে দিলো। বাথরুম থেকে কসমেটিক, মানে বডি লোশন, পেস্ট ব্রাশ, মুখের ক্রিম এই সব ভরে দিলো কসমেটিক রাখার ব্যাগে। রাহেলাকে বললো, দুতিন দিন তুমি ঐ হাসপাতালে থাকবে। ওরা তোমার প্রেসার কনট্রোল করে দেবে। কোনো চিন্তা করো না।

ম্যাজিকের মতো দুই যুবক এসে দাঁড়ালো কালো পোশাক পরে। অনেকটা স্কাউটের মতো।

ডাক্তার বললেন, এরা আমাদের ছেলে, এ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যাবে তোমাকে।

সরু ট্রলি নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লো ওরা। তারপর কোনো পথে কীভাবে রাহেলা হাসপাতাল থেকে বের হলো এবং ঐ হাসপাতালে পৌঁছোলো, সেটা বলতে পারবে না। সবটাই নভোযানের স্পেসশিপের মতো মনে হয়েছিলো।

কেটে গেলো ওখানে নয় দিন। পাগলা ঘোড়ার মতো প্রেসার কন্ট্রোল করতে গিয়ে ওদেরকেও হিমশিম খেতে হলো। পরীক্ষা নিরীক্ষার বাকি রাখেনি কিছু। তারও মধ্যে ভেবেছে রাহেলা, রেহা-তে গিয়ে কুবরাকে পাবে তো? শাড়িটা ওকে না দিতে পারলে খুব খারাপ লাগবে তার।

শঙ্কাই ঠিক হলো। নয়দিন পরে রেহা-তে ফিরে জানা গেলো, কুবরা চলে গেছে কিলে। শাড়িটা ঠিক সেখানেই রাখা আছে। হয়তো রেহা থেকে কুবরার ফোন নম্বর নেয়া যায়, হয়তো ডাক যোগাযোগের ঠিকানাও পাওয়া

যাবে, কিন্তু কোনোটাই করতে ইচ্ছে হলো না তার। এমনি থাক সব। এই ক্ষণিকের পরিচয়, এই সেবা, এমন 'মা জি' ডাক, এই বুকের মধ্যে কেমন তৃপ্তি ভাব, এটাই ভালো। জলবে জোনাকির মতো টিপ টিপ করে।

কুবরা এসেছিলো তার চরম অসুস্থতার মধ্যে। যোগাযোগের সূত্র হলো, একদা এক দেশের মানুষ ছিলো তারা। সেই পরিচয় তো রক্তাক্ত ক্ষত বিক্ষত হয়ে ছিঁড়ে গেছে প্রায় অর্ধ শতাব্দী হতে চললো। এখনো পাকিস্তান নাম শুনলে ভয়াবহ স্মৃতির আইকন ঝিলিক দিয়ে ওঠে মনের আয়নায়। সেই দেশের এক মেয়ে কোনো ঋণ শোধ করে গেলো আমার কাছে। ওর পা দাবানো কী ক্ষমা প্রার্থনা ছিলো? সমস্ত পাকিস্তানের পাপ ক্ষালন করা ছিলো? কোনো প্রাণের টানে এসেছিলো রাহেলার কাছে কুবরা?

কোনো প্রশ্নের উত্তর পায় না রাহেলা। আবার সেই কবির কথা, দেশ কাল সব মিছে হয়ে যায় হৃদপদ্মের বাগানে। কী অনায়াসে রাহেলার হৃদপদ্মের বাগানে ঢুকে পড়েছিলো কুবরা?

আহারে জীবন! এক জীবনে কুবরার মতো মানুষ হয়তো একবারই পাওয়া যায়। কেউ হয়তো সেটাও পায় না। ওর কি মনে থাকবে রাহেলার কথা? যাকে 'মা জি' বলে ডেকেছিলো? বুকের মধ্যে তোলপাড় করে।

অসুস্থ রাহেলা ক্রাচ দুটো ক্লিপে আটকে রেখে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। মনে মনে বলে, ভালো থেকো বিটিয়া। তুমি অনেক দিলে। ছোটো হয়ে থেকে গেলাম আমি। সামান্য উপহারও দিতে পারলাম না। নিরব অশ্রু টপ টপ করে বালিশে পড়তে লাগলো।

বাইরে ঘুঘু ডাকছে ঘুঘু ঘুগ, ঘুঘু ঘুগ। গাঙচিল ডাকছে ওড়ার আনন্দে। সাগর নাচছে দিশাহীন সীমাহীন আনন্দে। শরতের বাতাসে গাছপালা শব্দ করে দুলছে। পৃথিবীতে যে নন্দন রসের আকাল নেই, তার প্রমাণ প্রকৃতি নিজেই। আর অপাপবিদ্ধ ভালোবাসা তো বিশ্বময় ছড়িয়ে আছে জোছনার মতো।

অগোচর

আমেরিকা গিয়েছিলো শাহি চার সপ্তার জন্য। বহু দিনের পরিকল্পনা যে একমাস চুটিয়ে ঘুরে বেড়াবে। পরে নিজেই পরিবর্তন করলো পরিকল্পনা। আমেরিকার বেড়ানো একটু ছোটো করতে পারলে দুদিন লন্ডন আর চারদিন বার্লিনে থাকা যাবে। তাহলে মোটামুটি ট্রিপটা ভালো হয়। পঞ্চাশ পেরোনোর পরে এখন যে কয়জন বন্ধু আছে, তার মধ্যে এরা এখনও জানে জিগরি দোস্ত।

অনেক ধানাই পানাই করে লস এঞ্জেলেসের চাচা শাকুর সাহেবকে বলে শাহি, চাচা, এবার তোমার এখানে সাতদিন থাকা যাবে না।

-বলিস কী রে? হঠাৎ মতের পরিবর্তন?

-হঠাৎ না চাচা। ভেবে দেখলাম, লন্ডনের রাজা আর বার্লিনের মিশুর সাথে এবার দেখা না করলে অন্যায় হয়ে যাবে।

-তোর চাচি, মানে খালা নিশ্চয় মাইন্ড করবে।

-খালাকে আমি ম্যানেজ করবো চাচা। তুমি শুধু মেনে নাও।

-কী আর বলবো বল? তোরা বড়ো হয়েছিস। তোদের কথা মেনে নিতেই হয় আমাদের।

-আজই বলবো খালাকে কথাটা।

খাওয়ার টেবিলে সব বাংলাদেশের রান্না। ইলিশ মাছ, কই মাছ, গরুর মাংস, লাল শাক ভাজি, করলা ভাজি, মুগের ডাল, এই সব দেখে শাহির আনন্দ আর ধরে না। বরাবরই শাহি ভালো মন্দ খেতে পছন্দ করে। চাচা

বলেন, গরুর মাংস আর ইলিশ মাছ একসাথে না খাওয়াই ভালো। আবার ডেসার্ট আছে।

-খাওয়ার সময় ডাক্তারি করোনা চাচা। মিনতি করে শাহি।

-তোর চাচার তো এই কাজ। খালা মুখ ভার করে বলে, খেতে শুরুই করলো না ছেলেটা।

-দেখছো না, একটু মুটিয়ে গেছে তোমার ছেলেটা। ডাক্তার শাকুর মিহি গলায় বলে।

-একটু কী চাচা? প্রায় ডবল হয়ে গেছি। শুনেছি, মা আর খালা নাকি আমাকে ঠুঁসে ঠুঁসে খাওয়াতো ছোটো বেলায়। উচ্ছল হাসি শাহির মুখে।

-থাক আর ওসব কথা বলতে হবে না। তুই তোর ইচ্ছে মতো খা দেখি। আমি উঠিয়ে দেবো শেষে ইলিশ?

-না খালা, আমি নিজেই নেবো। তুমি বসে যাও প্লিজ।

চাচা খালা, মানে চাচির মনে কষ্ট দিয়েই শাহি চলে আসে লন্ডনে। এই চাচি আসলে শাহির খালা। দুই ভাই দুই বোনকে বিয়ে করে। কিন্তু খালা ডাকটা শাহি আর পারেনি ছাড়তে।

হিথরো এয়ারপোর্টে নিতে এলো রাজা আর লিসা। প্রায় দশ বছর পর দেখা। খুব খুশি হলো দুজনে শাহিকে দেখে। রাজা বলে, যাক এতোদিনে ম্যানলি হয়েছিস।

-মানেটা কী হলো? আগে কি ওম্যানলি ছিলাম?

-হা হা হা, মানে গায়ে গতরে একটু মাংস লেগেছে এতো দিনে, এটাই বলতে চেয়েছি।

-একটু কিরে? প্রায় তিন ডবল হয়ে গেছি।

-না না শাহি, যতো বলছো ততো না। তবে ইউ লুক ভেরি হ্যান্ডসাম এন্ড এলিগ্যান্ট, বলে লিসা। উচ্চকণ্ঠে হাসে তিনজনেই।

আসলে বয়স একটা ফ্যাক্টর। রাজাও বেশ মোটা হয়েছে। লিসাও আর সেই তন্বি নেই। সারা রাস্তা ড্রাইভ করলো লিসা। লন্ডন শহর থেকে প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পথ। গ্রাম বলা যাবে না, কিন্তু উপশহর বলা যায়। চাকরিজীবিদের অনেকেই লন্ডন শহরের কেন্দ্র থেকে একটু দূরেই থাকতে চায়। নিরিবিলি তো বটেই, একটু সাশ্রয়ও হয়।

চমৎকার বাগানওয়ালা বাড়ি। ফল ফুল সবই লাগিয়েছে রাজা। ও বললো, বাগানের সখ বেশি লিসার। খাটা খাটনিও সেই করে। আমি শুধু মাঝে মাঝে ঘুর ঘুর করি ওকে সঙ্গ দেয়ার জন্য।

-তোর খেলোয়াড় ছেলে কই? বাড়িতে নেই?

-লিসবনে খেলতে গিয়ে ইনজুরি হয়েছে হাঁটুতে। চিকিৎসা নিচ্ছে হাসপাতালে।

-দিন কতো বদলে গেছে রাজা, আমাদের কালে খেলা যে একটা পেশা হতে পারে, সেটা কল্পনাই করা যেতো না।

-ঠিক বলেছিস শাহি।

-আমাদের মিশু কী ভালো ফুটবল খেলতো। তখন তো ন্যাশনাল টিমে খেলার তেমন ছেলে ছিলো না। ওকে ডেকেছিলো না? মনে আছে?

-মনে থাকবে না? তোলপাড় করে তুলেছিলেন চাচা, মানে মিশুর বাবা। আমাদের ডেকে ওকে বোঝাতে বললেন। সে এক সময় গেছে। পরিবারের তরফ থেকে পাহাড়ের মতো বাধা এসে সামনে দাঁড়ালে হয় না সে কাজ রে।

-লিসা বিদেশি মেয়ে। ওরা মানুষের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। আমি চাইনি যে, বাপি খেলার পেশা বেছে নিক। কিন্তু লিসা বলে, ওর জীবন ওকেই বুঝে নিতে দাও। এই বাইশ বছর বয়সে তিন তিন বার ইনজুরি হলো। ভালো লাগে বল?

মোটামুটি বাংলাদেশি খাবার রান্না করেছিলো দুজনে মিলে। শাহি অবাক হলো রাজার রান্নার ন্যাক দেখে। প্রশংসা শুনে রাজা বলে, বিদেশে রান্নাটা

এন্টারটেইনমেন্টের মতো। মাঝে মাঝে রান্না করতে বেশ ভালোই লাগে। লিসাও বেশ পছন্দ করে আমার রান্না।

-ও ঝাল খেতে শিখেছে?

-ঐটা হয়নি। ঝাল নিতেই পারে না। ফলে কাঁচা মরিচ দিই আস্ত আস্ত।

-ভালো বুদ্ধি তো!

সারা রাত দুই বন্ধু গল্প করলো। বলতে গেলে সবই খাজুরে গল্প। আসলে খাজুরে গল্পই তো গল্প। কাজের কথা বলে কি রাত কাটানো যায়? সত্যিকার বন্ধুত্ব একটা ভারি আরামদায়ক সম্পর্ক। মনে হলো তারা ফিরে গেছে কিশোর বেলায়। ক্যাডেট স্কুলের জীবন আর দশটা স্কুলের চেয়ে অন্য রকম বরাবরই। দুই বন্ধু খেলা ধুলোয় ছিলো দারুণ। সেজন্য স্যারেরা ভালোবাসতেন। সিনেমার মতো মনের পর্দায় ভেসে ওঠে সব স্মৃতি।

দু'দিন যেনো দু'ঘণ্টায় কেটে গেলো। এবার বার্লিনে মিশুর ওখানে যাওয়া। কাল রাতেও কথা হয়েছে। ওর বউ দিবাও কথা বললো। ইউনিভার্সিটির জীবনে দিবা ছিলো সকলের 'ড্রিম গার্ল'। শাহি মনে মনে ভালোবাসতো দিবাকে। বেশ ভালো গান গাইতো। এক অনুষ্ঠানে দিবার সাথে মিশু হেঁড়ে গলায় গানের ধুয়া ধরেছিলো। সেই ক্রেডিটেই কিনে ফেললো দিবার মন। যেনো ছোঁ মেরে কোনো গাংচিল সাগর থেকে মাছ তুলে নিলো।

তো যাক, ওরা ভালো আছে, সেটাই সবচেয়ে আনন্দের কথা। তবে দিবার কথা তার মনে পড়ে হঠাৎ হঠাৎ। কেমন নড়ে চড়ে ওঠে বুকের ভেতর। কেউ জানে না তার এই কষ্টের কথা। বলতে কি দিবাকে দেখার জন্যই শাহির বার্লিনে আসার প্রোগ্রাম। খুব ইচ্ছে করছিলো ওকে দেখতে। কাউকে তো আর বলা যায় না সে কথা। ভাবের ঘরে চুরি করে থাকতে হয়।

খুব রাগ হয়েছিলো মিশুর ওপর। শাহি ওর থেকে ভালো গান করতে পারতো। কিন্তু দিবার কণ্ঠ এতোই মিষ্টি, তার লজ্জা হয়েছিলো। বুক চিতিয়ে স্টেজে উঠে গেলো মিশু। অনেক দিন কষ্ট পেয়েছে শাহি। ষাটের দশকে প্রেম ছিলো পিউরিটান। বেশি কাছাকাছি যাওয়া যেতো না। দিবাকে ছাড়া জীবনটা কাটিয়ে দিলো তো। কখনও ওর খারাপ চায়নি।

আসলে মানুষ কোনোদিন কি মনের গোপনতম কথা কাউকে বলতে পেরেছে? শাহির মনে হয়, পারেনি। ভাবের ঘরে চুরি করা যায়, কিন্তু

ভাবের ঘরে কাউকে ঢুকতে দেয়া যায় না। মানুষ এক আজব জিনিস! কতো সিক্রেট যে মনের অগোচরেও বাস করে, তার খবর মানুষ নিজেই কি জানে সব? কতোদিন পর দিবাকে দেখবে! ও কি জানতো যে, শাহিও তাকে মনে মনে চাইতো? যাক ওসব কথা।

ওদের সন্তানাদি হয়নি। অনেক ডাক্তার বদ্যি দেখিয়েছে। পরীক্ষা নিরিক্ষা করিয়েছে। অবশেষে জানা গেলো, মিশুরেরই সমস্যা। শুক্রানু নির্গত হওয়ার সাথে সথে তা মরে যায়। মিশু বলেছিলো, টিউব বেবি নিতে। তাতে দারুণ আপত্তি দিবার। শুধুমাত্র নিজের ডিম দিয়ে অন্যের বাচ্চাকে লালন করতে পারবে না নিজের শরীরের মধ্যে। অনেক পরে একটা মেয়ে এডপ্ট করেছে মিশু আর দিবা। তাকেই মানুষ করছে অতি যত্নে।

বার্লিন এয়ারপোর্টে মিশুদের সাথে একটা কালো নাদুশ নুদুশ মেয়েকে দেখে প্রথমে বুঝতে পারেনি যে, এই সেই মেয়ে, যাকে তারা এডপ্ট করেছে। তৃতীয় বিশ্বের মানুষ যতোই শিক্ষিত হোক, সংস্কার সাধারণত যায় না। প্রথমেই মনে হলো, জার্মানিতে থেকে একটা ফুটফুটে বাচ্চা এডপ্ট করতে পারলো না? দিবার পাশে ওকে ঠিক মানাচ্ছে না। নিজেকে নিজেই তিরস্কার করে শাহি, এসব কী ভাবছে সে? সুখের অবয়ব এক এক জনের কাছে এক এক রকম। ওরা ভালো থাকলে তার এতো সব ভাবার দরকার কী?

ইমিগ্রেশন থেকে বেরোতেই ওরা এগিয়ে এলো। মিশু জড়িয়ে ধরলো শাহিকে। দিবাও আলতো করে জড়িয়ে ধরলো আবেগে। মেয়েটা মায়ের গা ঘেঁশে দাঁড়ায়। দিবা বলে, ও মারিয়া। আমাদের একমাত্র মেয়ে।

ধীরে ধীরে ওরা পার্কিং লটের কাছে গেলো। ঝক ঝকে 'বি এম ডব্লিউ' গাড়িতে করে রওনা দিলো বাসায় পথে। মিশু বলে, কী রে, চুপ করে আছিস কেন?

-দেখছি দুই পাশে। এতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সব।

-সত্যি। পরিচ্ছন্নতা জার্মান জাতির জীবনের অঙ্গ।

-আমরা বলি, পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ। কিন্তু পালন করে এরাই।

-তুই তো আমেরিকা লন্ডন হয়ে এলি। ওসব দেশও তো পরিষ্কার শাহি।

-কথা ঠিক। তবে তামা আর কাঁসা মাজলে কি এক রকম চক চক করে?

হো হো করে হেসে ওঠে মিশু, ভালো তুলনা দিয়েছিস তো!

শাহির মনটা যে হারিয়ে গেছে কোথায়, কেউ জানলো না। দিবাও কি অতীতের কথা ভাবছে? একদা না বলা কিছু কথা মনে পড়ছে? ও কথা বলছে না কেনো? কিছু তো নিশ্চয় ভাবছে। মেয়েটা অনেক কথা বলছে দিবার সাথে। সব কথার জবাব দিচ্ছে না দিবা। মারিয়া জোরে বলে ওঠে, মা, আমার কথা শুনতে পাচ্ছো?

পেছনে বসেছে মা আর মেয়ে। মনে হলো, আনমনা দিবা একটু বিরক্ত হলো, শুনছি তো মা। বুঝেছি, তোমার খিদে পেয়েছে। এই তো বাসায় গিয়ে খাবো সবাই। ওকে?

-না মাম্মি, আমি এই নতুন চাচুর বেবি কয়টা তাই জানতে চেয়েছি।

-তুমি জিজ্ঞাসা করো বাসায় নেমে।

স্পস্টই বোঝে শাহি, দিবা অন্যমনস্ক আছে। এই তো একটু আগে হাসি মুখে তাকে হাগ করলো। কী অতুলনীয় স্পর্শ! কী দরকার ছিলো মনটাকে বেতাল করে দেয়ার?

বিশ মিনিটেই বাসায় পৌঁছে গেলো। দোতলায় একটা তিন বেডরুমের এপার্টমেন্ট। একটু অবাক হয় শাহি! এতোদিন আছে এদেশে, বাগানওয়ালা খোলা মেলা বাড়ি থাকবে না? তবে বাসাটা বড়োই। একটা ঘরে লাইব্রেরি। এটা দিবার সখ। এখন তো একটা মেয়ে নিয়েছে। তার আগে সবই ফাঁকা ফাঁকা লাগতো। পড়ার অভ্যাস ছিলো বলে বেঁচে গেছে দিবা।

আরাম দায়ক লিভিংরুম। সুন্দর করে সাজানো। বাহুল্য নেই কিন্তু আভিজাত্য আছে। ঘরে ঢুকতেই মন ভালো হয়ে যায়।

মিশু বলে, কি রে একেবারে খাবার টেবিলে যাবি, না আগে চা কফি কিছু হবে?

-মনে হয় মারিয়ার খিদে পেয়েছে।

-তুই তোর কথা বল, এখনই খাবি কি না?

কিচেন থেকে দিবা বলে, আমি মারিয়াকে খেতে দিচ্ছি। মাত্র সাড়ে বারোটা বাজে। আমরা না হয় এখন এক কাপ চিনা চা খাই, কি বলো শাহি?

-উত্তম প্রস্তাব। খিদেটা একটু লাগুক ভালো করে। তাছাড়া চিনা চা তো যখন তখন খাওয়া যায় পানির মতো।

-আমরা খুব পছন্দ করে খাই। এখানে এক চিনা বন্ধু আছে, সে মাঝে মাঝেই কয়েক প্যাকেট চা নিয়ে আসে।

-আজকে খাওয়া হবে কি? শাহি পেটুকের মতো জানতে চায়, সেটা কিন্তু শুনিনি।

-কী খেতে চাস? কোন্ দেশি খাবার চাই বল?

-অবশ্যই বাংলাদেশের খাওয়া। শাহি জোর দিয়ে বলে।

-এই যে দিবা, শাহিকে শুনিয়ে দাও আজ কী কী আছে খাবার।

-তুমি বলে দাও না মিশু। আমি একটু দূরে আছি না?

-তুমি এসে পড়ো আমাদের মাঝে ভাই? গেস্ট রেখে কোথায় কী করো?

-আসছি বাবা, এখনি আসছি। মারিয়ার খাবার গুছিয়ে দিয়ে আসি।

শাহি বলে, বেড়ানোর প্রোগ্রাম ঠিক করেছিস?

-তোকে ম্যাপ এনে দিচ্ছি, দেখে দেখে বলো।

-কী আশ্চর্য! দায়িত্বটা ছিলো তোর। এখন আমার ঘাড়ে দিচ্ছিস কেন?

-শোন, কাল আর পরশু তোরা টুওরিস্ট বাসে কিছু দেখে নে।

-মানেটা কী হলো? তুই ছুটি নিসনি?

-আমাদের বিগ বস আসছেন হেড অফিস থেকে, তাই ছুটি নিতে পারিনি ভাই।

-কেমন কথা হলো?

-আরে বাবা, তারপর তো উইকেন্ড। আমি সোম, মঙ্গল দু'দিন ছুটি নিয়েছি। তার মানে একটানা চার দিন আমরা ডানা মেলে উড়বো যেখানে খুশি। হা হা হা, ঠিক আছে?

দিবা এলো আসরে চা নিয়ে। বিদেশে তো এই এক জীবন। হুকুম শোনার কেউ নেই। সব কাজ নিজেদেরই করতে হয়। চায়ের সাথে ছোটো ছোটো নোনতা বিস্কুট।

-এইবার বলো ভাই, আজকের মেনু কি কি? মিশুই জানতে চায়।

-তুমি তো জানো, বললে না কেনো? দিবা হাসে। মিষ্টি হাসিটা তেমনই আছে।

শাহি একবার মিশুর দিকে আর একবার দিবার দিকে তাকায়। বলে ঠিক আছে, একেবারে খাবার টেবিলে গিয়ে ও দেখবো।

-তুমি শুটকি খাও তো শাহি? দিবা জানতে চায়।

-ব্যাঙকে বলো, পানি ভালোবাসে কিনা?

খাবার টেবিলের আয়োজন দেখে মন ভরে গেলো শাহির। বেগুন দিয়ে পাঙাস মাছ, তেলাপিয়া মাছের আস্ত ভাজা, চাঁন্দা মাছের শুটকি, করলা ভাজি, পেঁয়াজ মরিচ ভেজে লাল করে আলুর ভর্তা, মুরগির কশা কশা রান্না আর ভাজা মুগের ঘনো ডাল। সাথে টমেটো আর শশার সালাদ। ডেসার্টও আছে দেখা যায়।

শাহি প্রথমেই সিদ্ধান্ত নেয় যে, মুরগি এবং পাঙাস মাছ খাবে না। বাকিগুলো চলবে। তা শুনে মিশু বললো, কোনো জোরাজুরি নেই। তোর যেটা ইচ্ছে খাবি।

দারুণ একটা খাওয়া দাওয়া হলো। রান্নার জবাব নেই। শাহি বলেই বসে, দিবা যে এতো ভালো রান্না করে তা কোনোদিন জানা হতো না এখানে না এলে। মিশু তড়িঘড়ি উঠে গেলো কিচেনে। বাসনগুলো সব ডিশ ওয়াশারে রাখার কাজটা সে করে। শাহি বললো, আমি কী করবো তাহলে?

-তুমি টেবিল মুছে ফেলো শাহি, দিবা হাসতে হাসতে বলে।

-ভাবছো আমি কোনো কাজ পারি না?

-নিশ্চয় পারো। আমি তো মনে করেছিলাম, বউ কাজ শেখায়নি।

-ঠিক আছে, রাতের রান্না এবং বাসন ডিশ ওয়াসারে দেয়ার দায়িত্ব আমার।

ঘড়ির কাঁটায় বাধা জীবন। সকালে মিশু চলে গেলো কাজে। বলে গেলো, বিকেলে এসে পার্কে যাবে। মারিয়াকে স্কুলে নিয়ে গেলো দিবা। মা মেয়ের জন্য একটা গাড়ি। দিবাই চালায় সেটা। মেয়েকে স্কুলে দিয়ে কিছু সবজি আর ফল কিনে আনলো দিবা। আবার যাবে ওকে আনতে বারোটার সময়। মাঝখানের সময়টাতে সারা দিনের রান্না বান্না সেরে ফেলে।

দিবার লাইব্রেরি দেখতে চাইলো শাহি। দিবা ভারি খুশি তাতে। নিয়ে গেলো দেখাতে। দেশি বিদেশি বইয়ের বেশ ভালো সমাহার। শাহি বললো, আতিক রাহিমির বইও আছে দেখছি।

-পড়েছো তুমি?

-এইবার পড়লাম চাচার বাসায়। চাচাও খুব পড়ুয়া।

-খালেদ হোসাইনির বই পড়েছো?

-পড়েছি।

-তিনটেই?

-না শুধু 'কাইট রানার'। অসাধারণ লেগেছে। অসাধারণ সুন্দর ভাষা।

-দুটো জায়গায় আমি আমাদের দেশের একটা উপন্যাসের সাথে মিল পেয়েছি।

-কি নাম উপন্যাসের?

-অয়নাংশ।

-কোথায় কোথায় মিল পেলে?

-দেশের বর্ডার পার হওয়ার সময় যখন নায়কের বাবা এক মুঠি দেশের মাটি ভরে নেয় নস্যির কৌটোয়, আর নায়ক যখন ঘুড়িটা ধরার জন্য সামনে দৌড়োয়। অয়নাংশের নায়িকাও মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশ থেকে ওপার বাংলায় যাওয়ার সময় নদীর ধার থেকে এক মুঠি বালি তুলে নিয়েছিলো। আর শেষে নায়িকা বলছে, আরো অনেক পথ বাকি। চলতে হবে তাকে সামনে।

-কী আশ্চর্য, কাঁদছো কেন দিবা?

-অয়নাংশ পড়লে তুমিও কাঁদবে নায়িকার গলা ধরে।

-এবার দেশে গিয়ে অবশ্যই পড়বো বইটা। কথা দিলাম।

-তোমরা তো আবার মেয়েদের লেখা পড়ো না।

-উমম, কথাটা একেবারে বেঠিক না। তবে অয়নাংশ আমি পড়বো। কোথাকার খালিদ হোসাইনি আর কোথাকার এক লেখিকা? দুটো মানুষের দর্শন এক হলো কী করে, সেটাই ভাবছি আর অবাক হচ্ছি।

-অবাক হওয়ার কিছু নেই। কথাই আছে, গ্রেট মেন থিঙ্ক এলাইক। আর জানো তো, চার খণ্ডের সাগা উপন্যাস এটাই প্রথম দেশে। এর প্রথম খণ্ড অনুদিত হয়েছে ইংরেজি ভাষায়। করেছেন ডক্টর বেলা দত্ত গুপ্ত। অন্যদিকে প্রথম আর দ্বিতীয় খণ্ড মারাঠিতে অনুবাদ করেছেন পুনের ডক্টর অপর্না ঝা। ওখানেই প্রকাশিত হয়েছে দুই খণ্ড একসাথে।।

-এতো খবর জানো কী করে?

-আমি চিনি লেখককে। আমার প্রিয় লেখক একজন। এদিকে এসো, দেখো ঐ লেখকের আরও কতো বই আমার সংগ্রহে আছে।

নিজের পায়ের সাথে পা লেগে হোঁচট খায় দিবা। পড়েই যেতো যদি না শাহি ধরে ফেলতো।

নিজেকে ছাড়িয়ে না নিয়ে দিবা জড়িয়ে ধরে শাহিকে। বলে, মিশুকে গ্রহণ করে তোমাকে কষ্ট দিয়েছি আমি শাহি।

-তুমি জানতে যে আমি...

-জানতাম। কতো যে মনে হয়েছে তোমার কথা।

-আমারও মনে পড়েছে তোমার কথা। কিন্তু দুজনের পথ দুদিকে চলে গিয়েছে। কিছু করার ছিলো না দিবা। আজ আর নাই বা মনে করলাম সেই সব দিনের কথা।

আস্তে করে দিবা ছাড়িয়ে নেয় নিজেকে। বলে, তুমি কি আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলে?

-কী বলছো দিবা? তোমার ভালো চেয়েছি সব সময়।

-আমি মা হতে পারলাম না শাহি। নিশ্চয় কোনো পাপ ছিলো আমার।

-একবিংশ শতাব্দীতে এমন কথা শুনলে লোকে হাসবে ডিয়ার। তা ছাড়া তোমার তো কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা মিশুর!

-বয়স আরো কিছু কম থাকলে আমি তোমার কাছে একটা সন্তান চাইতাম শাহি।

কড়াত করে বাজ পড়লো বুঝি। আগুন ধরে যাওয়ার কথা পুরুষের রিপুতে। কিন্তু আজন্মের সংস্কার, বউয়ের প্রতি সততা, ধর্মবোধের ন্যায়পরতা সজল মেঘের মতো নেমে এলো শাহির ওপরে। ঢেকে দিলো আগুনের শিখা। একটু সামলে নিয়ে বলে, কী বলছো পাগলের মতো দিবা? মানে বুঝে বলছো তো?

-এরকম ঘটনা দেখেছি বলেই বলছি। খুব ঠাণ্ডা গলায় বলে দিবা।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে থাকে দুজনেই।

শাহির মনে হলো, নির্ঘাত দিবার মানসিক সমস্যা হয়েছে। হঠাৎ করে এমন বেলাইনে কথা বলার মেয়ে সে নয়। দীর্ঘ দিন মা না হতে পারার ব্যর্থতা, তাও আবার নিজের কারণে নয়, এই কষ্ট চেপে রাখতে রাখতে কোথায় যেনো ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে। মনের অগোচরেই লালন করেছে এমন কথা। নাহলে এই কথা কেউ বলতে পারে হুট করে? মায়া হলো ওর জন্য। আহা, বেচারা! মায়া হলো মিশুর জন্যও।

নিস্তব্ধতা ভাঙে শাহি। বলে চলো চা খাওয়া যাক।

পরদিন আবার লাইব্রেরি দেখতে গেলো তারা দুপুরে। আজ সম্পুর্ণ সাভাবিক দিবা। কাল যে অমন একটা কথা বলেছিলো, সেটা যেনো ছিলো অন্য কেউ।

-এই যে শাহি, এখানে কিছু বই আছে দেখো। হাইনরিশ বোয়েল-এর বই যা তিনি নিজেই ইংরেজিতে লিখেছেন।

-নামটা অচেনা দিবা। জার্মান লেখক বুঝি?

-হ্যাঁ, অনেক আগে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। গুন্টার গ্রাসের অনেক আগে।

-গুন্টার গ্রাসের নাম জানি। তবে বই পড়িনি।

-পারলে 'টিন ড্রাম' নভেলটা পড়ো। অনেক বড়ো বই।

-সে কি কড়ি দিয়ে কিনলাম, দড়ি দিয়ে বাঁধলাম, কুলি দিয়ে আনলাম-এর মতো বড়ো?

হাসে দুজনেই।

আমরা কিন্তু খালিদ হোসাইনির কথা বলছিলাম কাল, তাই না? খালিদ হোসাইনি ইংরেজিতেই লেখেন। কিন্তু আতিক রাহিমি লেখেন ফরাসি ভাষায়। তবে আমি অনুবাদককে বিপুল ধন্যবাদ দিই। চমতকার অনুবাদ। মনে হবে, ইংরেজিতেই লেখা বইটা।

শেষ হলো হামসফর। পরিপূর্ণ আনন্দ নিয়ে শেষ হতে পারতো ভ্রমণটা। কিন্তু তা হলো না। দিবার চিকিৎসা দরকার, এই কথাটা মিশুকে বলতেও পারলো না শাহি। অন্য দিকে এমন কিছু উন্মোচিত হলো, যা নাহলেই বোধ হয় ভালো হতো। সব সত্য সুন্দর নয়। শুভ নয়।

তবুও তার কোনো প্রিয় নারী দীর্ঘদিন ধরে ভালোবেসেছে, এমন কী তার সন্তান ধারণ করতে চেয়েছে, এই অদ্ভুত একটা রিন রিনে অনুভব তাকে আচ্ছন্ন করে রাখলো অনেক দিন। শাহি তো ভাবতেও পারেনি যে দিবা তাকে মনে মনে ভালোবাসতো। কথাটা কাউকে সে বলতেও পারবে না কোনোদিন। এই আনন্দ, এই ব্যথা, এই সুখবোধ একান্তই তার একার। আজীবন এই সত্যকে রেখে দিতে হবে পরম যত্নে ঢেকে, সবার অগোচরে। নিজের মনও যেনো জানতে না পারে তার খবর যখন তখন।

কাঠগড়া

ফায়ার প্লেসের ধিকি ধিকি আগুন দেখা যাচ্ছিলো তখনও। সুন্দর ওম হয়ে আছে ঘরটা। শেখ কিসমত খান তার পছন্দের চেয়ারে বসে আছে। শীতের দেশ। রাতের খাওয়া শেষে সকলে বসার ঘরে এসে বসে। নানা গল্প গুজব হয়। কখনও সুখের আনন্দের, কখনও বিষাদের বেদনার গল্প। কখনও তিক্ত অপ্রীতিকর গল্পও হয়। সে গল্প কখনও চোখের পানিতে ভাসতে থাকে। চোখ মুছতে মুছতে উঠে যায় কিসমত। কিছুক্ষণ স্থবির হয়ে বসে থাকে আরিফ আর সাবিনা। এরপর কয়েকদিন আর বসে না গল্পের আসর। তুষারঝরা রাতে বেদনায় দগ্ধ হতে থাকে ফায়ার প্লেসের নিঃসঙ্গ আগুন।

সেদিন গল্প চলছিলো আরিফের শৈশব নিয়ে। দূরন্ত ছিলো খুব। হাতে পায়ে একটা না একটা খোঁচা খামচি ছেঁচার দাগ থাকবেই রোজ। অনেক চিকিৎসা করে ঐ এক সবেধন নীলমনি এসেছে তাদের ঘরে। কিসমতের ভয়, কবে না জানি বড়ো কিছু ঘটে যায়। শাসন বারণ তো হতোই, কিছু মারধোরও হতো। কে যেনো বলেছিলো, হাত দিয়ে মারা ভালো না। তাতে বেশি লাগে। ক্ষতিও হয়ে যেতে পারে। পাতলা ছিপছিপে ছড়ি দিয়ে মারলে ক্ষতির ভয় কম। তাই বাড়ির মাধবি লতার ঝাড় থেকে চিকন লতার ছড়ি দিয়ে কখনও মেরেছে কিসমত। প্রথম আঘাতেই সেই ছড়ি ভেঙে কয়েক টুকরো হয়ে যেতো। ব্যথার চেয়ে ভয় পেতো বেশি আরিফ।

গল্পটা নতুন না। অনেকবারই ঘুরে ফিরে এসেছে গল্পের আসরে। সেদিন কি যে হলো, খেপে গেলো আরিফ। বললো, যাকে মারা হয়, সেই জানে কতোটা লাগে।

-তারপর আদর করতাম না কতো?

-তা করতে। কিন্তু রাগটা থেকেই গেছে।

-শাসনে বারণে ছেলেমেয়েকে একটু আধটু মারামারি সব পরিবারেই আছে বাবা।

-কাজটা যে কতো খারাপ, তা ইউরোপে না আসলে জানতেই পারতাম না।

-ভেবে দেখ, দেশে রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্য থেকে বিএ পাশ করিয়ে বিদেশ পাঠানো পর্যন্ত কতো আগলে রাখতে হয়েছে তোকে!

-সেটা মা বাবার দায়িত্ব। এতে ক্রেডিট নেয়ার কী আছে? কর্কশ গলায় বলে আরিফ। উঠে যায় সে খাওয়ার ঘরের দিকে।

সাবিনার চোখ টিভির দিকে। একটা ক্রিমিন্যাল সিরিয়াল চলছে। স্পেনের মাদ্রিদের মেয়ে, লেখাপড়া লন্ডনে। বাবা স্প্যানিশ, মা ব্রিটিশ। এমনি ভালোই। একটু রেসিস্ট, এই যা।

ফ্রিজ খোলা আর বন্ধ করার শব্দ শোনা যায়। নিশ্চয় বিয়ারের ক্যান খুলে খাবে এবার। প্রত্যেক সন্ধের রুটিন পান তো সন্ধে বেলায় ডিনারের আগেই হয়ে যায়। অবশ্যই বাবার চোখের আড়ালে।

মন বিষণ্ন হয়ে যায় কিসমতের। বেশি পান মানেই মেজাজ খারাপ করবে। দুনিয়ার কষ্টের কথাকে ডেকে তুলে আনবে। গা কেটে রক্ত ঝরানোর খেলা শুরু হবে। নিজের কথা বাদে অন্য বহুজনের কথা বলবে। মা বাবার পিণ্ডি চটকাবে।

এসে ঘরে বসলো আবার। মুখটা আঁধার হয়ে আছে। মানে, অনেক বাজে কথা তুলে এনেছে জীবনের ভাগাড় থেকে। কে কবে কি বলেছে, বাবা কবে কান ধরে টেনেছে, চাচা কবে গাল দিয়েছে, মা কয়টা মাধবিলতার ডগা ভেঙেছে পিঠে, চাচাতো খালাতো ভাইবোনেরা কি বলে তার কথা, মা কবে তার পক্ষ না নিয়ে খালাতো বোনদের পক্ষ নিয়েছে, এইসব নিয়ে ঘন্ট রান্না হবে এবার।

সংকুচিত হয়ে ওঠে কিসমত। এক সপ্তা আগেই ঘুরে এসেছে সে ছোটোভাই আলিহোসেনের বাসা থেকে। এবার তার নামও উঠে আসবে আজকের আসরে। ঠিক তাই।

সাবিনার দিকে তাকিয়ে আরিফ বললো, কী ছাইপাশ দেখো সারাদিন?

-মাইন্ড ইয়োর ওন বিজনেস ডিয়ার। সাবিনার শান্ত কথা। কিন্তু বেশ শক্ত এবং ধারে ভারে পোক্ত।

মনে হলো, মুখে কে এক থাবা কাদা মাখিয়ে দিয়েছে ছেলের । খারাপ লাগে কিসমতের। তার বৌয়ের এতো সাহস ছিলো না। দিব্যি হজম করে ছেলে বললো, ছোটো চাচার বাড়ির গল্প বলো বাবা।

-গল্প শুনে কি হবে? তুই বেড়াতে যা না একবার। দেখে আয় চাচাকে।
-আমি যাবো? কুয়ালালামপুরে? যেনো এর চেয়ে আশ্চর্য কথা আর কিছু নেই।
-কেন, চাচার বাড়ি কেউ যায় না?
-পুত্রজায়া থেকে যে কোনো সময় মিনা আপু চলে আসবে।
-মা বাবার বাড়ি আসবে না? ওর মেয়েটা যা মিষ্টি হয়েছে না?
-আপুটা নিশ্চয় তেমনি ঝগড়াটে থেকে গেছে বাবা। তাই না?
-কি যে বলিস না! ঘর সংসার হয়েছে, ছেলে মেয়ে বড়ো হয়েছে। সেই মিনা কি আর আছে?
-এই শুরু হলো মিনা আপুর প্রশংসা।
-তা ভালো হলে ভালো বলবো না?
-তুমি তো বরাবর মিনা আপুর বেশি প্রশংসা করো।
-তুই কি এখনও ছোটো আছিস? এখন হিংসে-হিংসি মানায়? কিসমত হাসে।
-হাসির কথা না, নিজের ছেলেকে ছোটো করে অন্যের প্রশংসা তুমিই করো শুধু।
-মিনা অন্য জন? তোর কেউ না?
-না। আপুর জন্য একদিন তুমি আমাকে মেরেছো। গন গন করে বলে আরিফ।
-এখনও সেই কথা মনে রেখেছিস?
-পিঠে বোধ হয় দাগও আছে।
-তাই নাকি? হাসে আবার কিসমত।
-হাসছো? তোমাদের লজ্জাও কম। মারার কথা বললে হাসো।
কান গরম হয়ে যায় কিসমতের। বলে, বাদ দে তো এইসব কথা। কতোবার এক কথা বলবি?
-সারাজীবন বলবো।

-তাতে লাভ?
-সত্যি কথা কারোই ভালো লাগে না বাবা। এদেশের মা বাবারা শুনলে তোমাদের ছি ছি করবে।
-আমরা তো বাংলাদেশি, এদেশি নই।
-তাইতে বেঁচে গেছো। নইলে পুলিশের হাতে পড়তে।
-তারপর?
-জেল, জরিমানা, অপমান।
-তুই খুশি হতে পারতি?
-খুব খুশি হতাম। মা বাবা হলেই যে সাত খুন মাফ, তা যে না, সেটা দেখতাম।
-তুই কেমন ছেলে রে?
-তুমি এতো নিষ্ঠুর ছিলে কেনো? বলো? মাও ছিলো তোমার সাগরেদ। কেন? জবাব দাও।
-আদর করিনি তোকে আমরা? তোর মা পরে বসে বসে কাঁদতো না?
-জানি, আজ আর তোমাদের কিছুই নেই বলার।
-মানে? কী বলবো? ভাগ্যিস তোর মা বেঁচে নেই।
-মাকেও প্রশ্ন করতাম, কেনো মেরেছে সে আমাকে? কিছুতেই ভুলতে পারি না সেই কষ্ট।

আর সহ্য হয় না কিসমতের। বড়ো একটা নিঃশ্বাস বুকে চেপে চলে আসে নিজের ঘরে। বুঝতেই পারে না, কেনো এমন করে আরিফ? প্রায় প্রতি সন্ধের এই এক নাটক। দিনের বেলায় অনেকটা স্বাভাবিক। যেনো কিছুই হয়নি, এমনি ভাব। সন্ধে হলে পানের সাথে সাথে ভূতের আগমন হয়। এটা আরিফও জানে। আর ভূত তো বসেই থাকে সুর্য ডোবার অপেক্ষায়। ক্যান বা বোতল খোলার সাথে সাথে 'হু হা হা হা' করে ডানা ঝাপটে বের হয়ে আসে। ঠোঁটে চুমু খেয়ে একেবারে চলে যায় গলার ভেতর দিয়ে পেটের মধ্যে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয় তার ভাগাড় নাচন।

মাঝে মাঝে কিসমতের মনে হয়, একদিন গলায় ঢেলে দেখবে, কি আছে ওতে? তার মনেও তো অনেক কষ্ট ঘুমিয়ে আছে। পান করলে কি সেগুলো জেগে উঠে সাপের মতো দংশন করবে অন্যকে? বিষে বিষ ক্ষয় হবে? চলে যাবে মনের কষ্ট? কিন্তু সেই যাওয়া তো সাময়িক যাওয়া। লোকে বলে, মদ খেলে কষ্ট ভুলে থাকা যায়। সেটা কতক্ষণ? বরং মনে হয়, কষ্ট লালন করতে চায় বলেই লোকে মদ খায়। কষ্ট পালা-ও তবে নেশা কি? সব

নেশাখোরই কি কষ্ট ভোলার জন্য মদ খায়? অন্য মানুষদের কোনো কষ্ট নেই? জগতে কষ্ট নেই কার? তারা কীভাবে কষ্ট হজম করে?

মাথা আউলা হয়ে যায় কিসমতের। এসব নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবতে পারে না। বিপত্নীক হওয়ার পর থেকে একা একা তার দিন কাটে না। ছেলে অনেক ডাকাডাকি করলো বেড়িয়ে যাওয়ার জন্য। আসি আসি করেও আসা হচ্ছিলো না দেশের বাড়ি খালি ফেলে। এবার টিকিট পাঠালো তাই বাধ্য হয়ে আসা লন্ডনে। এই তার প্রথম সফর বিদেশে। বউ জামিলার খুব সখ ছিলো লন্ডনে বেড়ানোর। ভাগ্যিস, কপালে ছিলো না। ছেলের এমন কঠিন সত্য কথা সহ্য করতে পারতো না সে।

সেই সব দিনের কথা ভোলেনি কিসমত। অনেক জটিল অবস্থা হয়েছিলো জামিলার। শেষ দিকে কথা বলতে পারতো না রুগ্ন মহিলাটা। ভাঙা কলসির মতো ঝর ঝর করে পানি গড়িয়ে পড়তো দুচোখ থেকে। বলতে গেলে দশ মাসই বিছানায় শয্যাশায়ী ছিলো জামিলা আরিফের জন্মের সময়গুলোতে। সেই মাকে বলে, বাবার সাগরেদ। বাবা যা বলে, তাই শোনে দাসীর মতো। একদিন বলেই বসলো, মা নাকি বাবার বৌ ছিলো শুধু। ছেলের চেয়ে বাবার দিকেই মনোযোগ ছিলো বেশি। ভালো খাবারটা তুলে রাখতো বাবার জন্য।

মনে মনে দুজন হয়ে তর্ক করে কিসমত কখনও। বলতে চায়, মা বাবার মিল মহব্বত দেখলে ছেলে মেয়েদের খুশি হওয়ারই কথা। তুমি সেটা নিয়ে তামাশার কথা বলছো?

-নিশ্চয় আমি নেগলেকটেড হয়েছিলাম, না হলে এমনটা মনে হয়েছে কেন?

-তুমি বুঝতেই পারোনি তোমার মাকে। সে খুব দায়িত্ব পরায়ণ ছিলো।

-আমার চেয়ে তোমার দিকে খেয়াল ছিলো বেশি, অস্বীকার করতে চাও?

-সেটা তো তোমার মায়ের গুনের কথা।

-তোমার কাছে মনে হতে পারে।

- তোমার কাছে মনে হয় না?

-না, একেবারেই না।

-তোমাকে ভালোবাসেনি তোমার মা? বোকা ছেলে?

-বোকা ভেবে আনন্দেই ছিলে। এখন দেখছো, আমি বোকা নই।

-কে বলেছে? এখন ভাবছি তুমি বোকা নও, আস্ত গাধা।

কদিন থেকে রাতে ঘুমের অসুবিধে হচ্ছে। মাথাটাও ভার ভার থাকে। হয়তো প্রেসার বেড়েছে। কিন্তু বলতে ইচ্ছে করে না ছেলেকে। অভিমানে নিজেকে গুটিয়ে রাখে। ডায়াবেটিসের মাত্রাও বেড়েছে। ওষুধ পত্র দেশ থেকেই এনেছে কিসমত। পরিমাণ একটু বেশি খেতে হবে মনে হচ্ছে।

চেহারা দেখে ছেলের বউ একদিন বললো, বাবা আপনার শরীর খারাপ মনে হচ্ছে। অভিমান দ্বিগুন হয়। পরের মেয়ের চোখে পড়ে, তার নিজের ছেলের চোখে পড়ে না?

দিন আর কাটতে চায় না ছেলের বাড়িতে। রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুম আসে না চোখে। বার বার একই প্রশ্ন মাথায় ঘোরে, কোথায় গলদ ছিলো তাদের? তারা কি কম মার ধোর খেয়েছে ছোটো বেলায়? সেটাই তো স্বাভাবিক ছিলো তাদের কালে। দুষ্টুমি করলে পিটুনি খেতে হবে। ব্যাস। আর কোনো কথা নেই। পরে অনেক আদর জুটতো। বাড়তি ভালো মন্দ খাবার পাওয়া যেতো। আইস্ক্রিম ছিলো মাস্ট। তাতেই গা থেকে ঝরে পড়তো কষ্টগুলো। কেমন করে এই প্রজন্মের ছেলেরা এতো জটিল হলো? এদের গা এতো এঁটেল কেনো? শৈশবের কষ্টগুলো সেটে বসে আছে গায়ে? কি নির্বিকারে নির্মম ভাষায় মা বাবার সমালোচনা করে?

কই বড়ো হওয়ার পর মা বাবার শাসন বারণ মারের কথা আর তো মনে পড়েনি কিছু? বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে জবাবদিহি তো অনেক পরের কথা। দিনকাল কি এতোই বদলে গেছে? নাকি আরিফই বদলে গেছে? সেতো বাবাকে কাঠগড়ায় তুলে সওয়াল করছে রীতিমতো।

কতো বড়ো হয়েও সে তাদের বিছানায় ঘুমিয়েছে। বাবা বাবা করে গলা জড়িয়ে থাকতো। কিছুতেই আলাদা ঘুমাতে চাইতো না। জামিলাই বেশি বলতো, নিজের বিছানায় শুতে হয় বাবা। বড়ো হয়েছো না? কতোদিন ঘুমোনোর পরে তাকে বিছানায় নিয়ে দেয়া হয়েছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে কখনও রাগ করেছে, কখনও বায়না তুলেছে। কতো আদরে থামাতে হতো। তবু কি সুখের দিন ছিলো তখন।

মফস্বল শহরের জেলা স্কুলে পড়ে আরিফ। ভালো ফল করে পরীক্ষায়। মনে কত আশা, ছেলে মস্ত বড়ো হবে। বিদেশ যাবে। বাড়ি হবে, গাড়ি হবে। বিয়ে হবে, পৌত্র-পৌত্রা হবে। জীবন নদীর শাখা প্রশাখা ছড়াবে তারপরেও। সংসারে আর তো কেউ নেই। ঘুরে ফিরে ঐ এক আরিফ। সব সপ্ন সব আশা, তাকেই ঘিরে।

রাজনীতিক অস্থিরতা নেমে এলো দেশে। চারদিকে ব্যাপক ধর পাকড় শুরু হলো। আরিফ ছাত্র রাজনীতি না করলেও মিছিল-টিছিলে যেতো। তাই নিয়ে কী ভয় মায়ের! রোজা রাখা, নফল নামাজ পড়া, মাজারে শিরনি দেয়া কি না করতো জামিলা! প্রার্থনা একটাই, আরিফ যেনো নিরাপদে থাকে।

কিসমত একবার আরিফকে নিয়ে চলে যায় গ্রামের বাড়িতে। মিছিলে তাকে ঢিল ছুঁড়তে দেখা গেছে। আজ একে ধরে কাল ওকে ধরে, সে এক চরম উদ্বেগের ব্যাপার। ভয়ে রেখে আসে ছেলেকে দাদুর বাড়ি মাস খানেকের জন্য। সেখান থেকেই পুলিশ ধরে নিয়ে জেলে দিলো। বেচারা জামিলা দুদিন ভাত পানি খায়নি ছেলের জন্য। সবই তো জানে আরিফ!

একবার ডেঙ্গু জ্বর হলো আরিফের। হাসপাতালে কেবিন পাওয়া গেলো না। ওয়ার্ডেই রাখতে হয়েছিলো ছেলেকে। একটানা সাতদিন সাতরাত ছেলের মাথার কাছে একটা কাঠের টুলে বসে থেকেছে জমিলা। বেঁচে থাকার জন্য কিছু খাওয়া আর নামাজ কালাম পড়াই ছিলো তার কাজ। সেই মায়ের সম্বন্ধে কোনো শ্রদ্ধা বোধ নেই? কবে মেরেছে, সেটাই প্রধান। বেচারা মরে গিয়ে বেঁচেছে।

উন্নত দেশের উন্নত প্রযুক্তি মানুষকে এতোটাই যান্ত্রিক করে দিয়েছে যে, মায়া মমতা ভালোবাসাও ওজন করে বুঝতে হবে? এমন আধুনিকতায় তারা অভ্যস্ত নয়। বাবা আর ছেলে এখন দুই ভুবনের দুই বাসিন্দা। কেউ কাউকে চিনতে পারছে না। ব্যথায় কুঁকড়ে যায় কিসমতের অন্তর।

হঠাৎ মনে হয়, ডেঙ্গু জরের সময় অনেক রক্ত দিতে হয়েছিলো আরিফকে। সেই রক্তেই কি কোনো দোষ ছিলো? তার রক্তে এমন ছেলে জন্ম নেয়ার কথা নয়। এতো বদলে গেছে ছেলে?

কিসমতের মনে হয়, সাবলম্বী না হলে হয়তো ছেলের টাকায় বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না। কী হতো তাহলে? বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসতো নিশ্চয়। যেমন মন মেজাজ দেখছে ছেলের, তাতে কাজটা অসম্ভব হতো না।

গুম হয়ে থাকলো কদিন। মাথায় আকাশ পাতাল ভাবনা। পিতা পুত্রের কথাবার্তা ভালো করে বোঝে না ছেলের বউ। বাংলাদেশি মেয়ে হলে হয়তো মধ্যস্থতা করতো। হয়তো বলতো, বাবা, আপনি ওর কথায় কান দেবেন না। ও এইরকমই। অথবা তা নাও হতে পারতো। অবশেষে সিদ্ধান্ত নেয় একটা।

কাউকে না বলে কিসমত হিথ্রো বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়। ফেরার টিকিট হাতেই আছে। সময় মতো প্লেন ছেড়েও যায় লন্ডনের মাটি। কদিনের মানসিক কষ্টে শরীরটা খুবই খারাপ লাগে তার। মাথা তো ভার ছিলোই, বুকে চাপ বোধ হচ্ছে প্লেনে বসার পর থেকে।

আকাশেই কিসমতের হার্ট এটাক হয়। চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা ছিলো না প্লেনে। এক সময় জ্ঞান হারিয়ে চেয়ারে এলিয়ে পড়ে সে।

সবার অলক্ষে চরম অভিমান বুকে নিয়ে নিতান্ত একাকী চলে গেলো কিসমত তারার দেশে।

বাংলাদেশের মাটিতে নামলো তার প্রাণহীন দেহ।

লাশের বুক পকেটে পাওয়া গিয়েছিলো একটা চিরকুট। ছেলের উদ্দেশ্যে লেখা দুটো বাক্য- তোমাকে বড়ো করেছি, মানুষ করতে পারিনি। ব্যর্থ পিতার মুখ যেনো তোমাকে আর দেখতে না হয়, তাই দেশে ফিরে গেলাম।

সম্বোধন নেই, ইতি নেই। কে লেখেছে, কাকে লেখা হয়েছে, কিছু বোঝা যায় না। আরিফ এলো পিতার শেষ কাজ করতে। বাড়ির পুরনো বিশ্বস্ত নিরক্ষর কাজের চাচা চিরকুটটা খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছিলো। মুর্খ হলেও বুঝেছিলো, ছেলের হাতে দিতে হবে কাগজটা।

কুলখানির দোয়া অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলো। আরিফের সহস্র স্মৃতি মাখা এই বাড়ি। লোকজন চলে গেলে খাঁ খাঁ করতে লাগলো মস্ত বাড়িটা। ঘুরতে ঘুরতে মা বাবার সাদাকালো ছবিটার সামনে এসে দাঁড়ালো সে। কেমন হু হু করে উঠলো বুকের ভেতর। কেমন এক ধরণের কষ্ট বুকের ভেতর পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতে লাগলো। ছবির ফ্রেমটাকে আদালতের এজলাস

আর বাবা মা-কে মনে হলো বিচারক। অশরীরি একটা পরিবেশে মনে হলো সে নিজে একটা ঝুলন্ত কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। বাবা মা দুজনেই সওয়াল করবেন তাকে।

ঝাঁ ঝাঁ কড়তে লাগলো মাথা। অভ্যেস বশে ঘরে গিয়ে একটানে ফ্রিজ খুললো। ক্যান বা বোতল কিছুই সাজানো নেই সেখানে। এবার মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো তার।

এমন সময় কাজের চাচা ঘরে এসে চিরকুটটা তাকে দিয়ে বললো, ছোটো চাচা, তোমার বাপের সাথে তো কথা হয়নি। এই একখান কাগজ ছিলো সার্টের পকেটে। দেখো তো কী লেখা আছে বাবা?

দুটো মাত্র বাক্য, পড়তে কতোটুকু সময় লাগে?

প্রতীক্ষা

দুবার রিং হয়েই কেটে গেলো ফোনটা। এই বিভূঁইয়ে আমার ফোন বেশি একটা আসে না। মনোযোগ দিয়ে একটা বই পড়ছিলাম। মাত্র পেয়েছি হাতে। নায়ক নায়িকার তর্ক যখন তুঙ্গে, তখন এলো ফোন। বিরক্তই হলাম। ভাবলাম, যাক কেটে গেছে। ভালোই হয়েছে। আবার চোখ দিই বইয়ের পাতায়। আলস্যের আরাম হারাম করে বই পড়া। তিন দিন পরে ফেরত দিতে হবে।

নায়িকা বলছে, এখন আমি বাচ্চা নিতে পারবো না।

নায়ক বলে, যে এসেছে তাকে নিয়ে নাও।

-তারপর? বাচ্চা পালবে কে?

-তুমি আমি দুজন মিলে।

-আমার প্রমোশনটা মাঠে মারা যাবে এখন বেবি নিলে। জানি, সেটাই চাও।

-চাকরি বড়ো, না আমাদের প্রেমের ফসল বড়ো?

-এইসব শোষণের ভাষায় কথা বলো না। আমি আজই যাবো ক্লিনিকে।

-প্লিজ এমন করো না।

-তুমিও এমন করো না প্লিজ।

-আমাদের তো প্ল্যানই ছিলো, এই বছরে বেবি নেবো।

-আমারও প্ল্যান ছিলো, তুমি ইরেনার সঙ্গ ছেড়ে দেয়ার পরে বেবি নেবো।

-কার সাথে কী মেশাও, বলতো হানি?

-কথায় আর কাজ হবে না ডিয়ার।

-আমি চাই, বেবিটা আসুক আমাদের ঘরে।

-আমি চাই না। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দুজনেই।

আবার রিং বাজে। নির্জন বিকেলের প্রহর বিদীর্ণ হয়ে যায় একেবারে। নাহ, এবার ফোনটা ধরা দরকার। বই রেখে উঠতেই হয়।

-হ্যালো, শুভ বিকেল।

-হ্যালো। শুভ বিকেল। ও প্রান্তের কথা।

-কে বলছেন ভাই?

-কণ্ঠ শুনে চিনতে পারলে না?

-আর একটু কথা বলেন প্লিজ।

-আমার তো এদেশে এই সময়ে আসার কথাই ছিলো, না? মেইল পাওনি?

-মানে, মানে, কার, কোথায়? কিসের মেইল? বুঝতে পারছি না।

মিষ্টি একটা হাসির আওয়াজ এলো। চেনা চেনা মনে হয় হাসিটা।

-কী হলো, এখনও চিনতে পারলে না?

-হার মানছি, প্লিজ বলেন আপনি কে? বিপন্ন লাগছে আমার।

-লাগুক, লাগুক, আর একটু বিপন্ন লাগুক। আবার হাসি।

কথাবার্তা এমন আপন জনের মতো যে, শক্ত কথাও বলতে পারছি না। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারি না কোথায় শুনেছি এই কণ্ঠ?

-হার মেনেছি, এইবার মাফ চাইছি, তো বলেন দয়া করে, কে আপনি?

-তাহলে থাক, পরে আবার কথা হবে। চিনতেই যখন পারছো না।

-প্লিজ রাগ করবেন না। বয়স হয়েছে। অনেক কিছুই ভুলে যাই আজকাল।

-তাই বলে আমাকেও ভুলে গেলে?

কী মুসিবত! রাগে দুঃখে নিজের গায়ে চিমটি কাটতে ইচ্ছে করছে। বলি, প্লিজ আর ধাঁধা নিতে পারছি না। মাথা ঘুরতে লেগেছে।

-পরশু বার্লিনে আসছি। সময় খুব কম হাতে। বার্লিন রেল স্টেশনের ম্যাকডোনাল্ডে অপেক্ষা করবো। তুমি চলে এসো। ঘণ্টা দুই গল্প করা যাবে।

-বার্লিনে যাওয়া বললেই যাওয়া? ভালো করে রাস্তা ঘাট চিনি না। যেতে পারবো কি না, কিছু না জেনেই প্রোগ্রাম করে রেখেছেন? অবাক মানুষ তো আপনি?

আবার সেই হাসি। তারপর বলেন, কী করবো বলো? হাতে এতো কম সময় পাবো তা ভাবিনি।

-এমন দেখা না হলেই ভালো ছিলো নাকি?

-না না, এই কথা বলো না। সতেরো বছর পর দেখাটা তো হবে। তোমাকে দেখার তৃষ্ণায় মরে যাচ্ছি প্রিয়জন।

এখনও মনে করতে পারছি না, কে এমন করে কথা বলতে পারে? প্রায় চার কুড়ি বছর সময় পার করেছি। এখন আমাকে দেখার তৃষ্ণা কার থাকবে? একাকী জীবনে বই পড়ে আর কিছু লেখা লেখি করে সময় কাটাই। পরিবারের সবাই ব্যস্ত। তাই আমিও খুঁজে নিয়েছি নিজের ব্যস্ততা। কানে ফোন রেখেই একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম।

-তাহলে ওই কথাই রইলো। পরশু বুধবার, বার্লিন রেল স্টেশন, ম্যাকডোনাল্ড, বেলা এগারোটায়। সেদিন যদি চিনতে না পারো, তাহলে পরজন্মে আবার দেখা হবে প্রিয়জন। তোমাকে ভালোবাসি। এই ভালোবাসা আছে, থাকবে, বাড়বে। তিনি

রেখে দেন ফোন।

সুনশান বাড়ি। স্তব্ধ বিকেল। বিছানায় খোলা বইটা। হাতে ধরা শব্দহীন ফোনের রিসিভার। শুধু তার কণ্ঠস্বর বাজছে আমার কানে। আগামী বুধবার, বার্লিন রেল স্টেশন ম্যাকডোনাল্ড, বেলা এগারোটায়। এই বয়সে রহস্য ভালো লাগে? কিন্তু মন থেকে, কান থেকে, ইথার থেকে শব্দগুলো যাচ্ছে না কিছুতে।

এমন বিপদেও পড়ে কেউ! কে হতে পারে? কার সাথে সতেরো বছর দেখা হয়নি? আমাকে ভালোবাসে। আমার সাথে দেখা করতে চায়। প্রিয়জন বলে সম্বোধন করে। বার্লিনে দেখা না হলে পরজন্মে দেখা হবে বলে জানায়। কেমন এক শিহরণ জাগে চেতনায়। একটু একটু ভালোও লাগে। ভালোবাসার কথা শুনলে এখনও এমন আকুল ব্যাকুল লাগে? নিজের কাছেই অবাক। মনটা তাহলে এখনও জীবিত আছে?

বাড়ির লোকজন আসবে সন্ধে আটটায়। এখন বাজে সাড়ে পাঁচটা। বই পড়ার বারোটা বেজে যায়। কিছুক্ষণ ঘরের ভেতর হাঁটাহাঁটি করি। একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। জার্মানির সামারেও মাঝে মাঝে আমার শীত করে। তার ওপর মেঘ করেছে। সোনায় সোহাগা। শালটা হাতের কাছেই থাকে। তুলে গায়ে জড়াই।

মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ছে না তার কথা। সে কি সেই পুনের বন্ধুটা? একবেলা না দেখলে যার বদহজমের মতো হতো, সেই কি? শীর্ণ মুঠা নদীর ধার দিয়ে হাত ধরা ধরি করে হেঁটে হেঁটে বাজার করতে যেতাম একসাথে, সেই কি? মুঠা নদীর ব্রিজের ধারে বসে বসে গান গাইতাম দুজনে মিলে, সেই তার সাথেই তো। ডেকান কলেজে একসাথে বসে টিফিন খেতাম সেই মারাঠি মহিলার রেস্তোঁরায়। বিশেষ করে সাবুদানার খিঁচুড়িটা খুব ভালো বানাতো মহিলা। চা-টাও ছিলো চমৎকার। কান্ধা পোহে মন্দ ছিলো না। প্রথম প্রথম খিঁচুড়ি থেকে কারিপাতা বেছে ফেলে দিতাম। আমার ভালো লাগতো না। ও বলতো, আহা ফেলো না, আমাকে দাও।

কী অনায়াসে আমার ছোঁয়া খাবার খেয়ে নিতো! কতোদিন এক থালাতে দুজনে মিষ্টি, চানাচুর, বিস্কুট খেয়েছি। আমি বলতাম, তোমার জাত যাবে 'চিতপাবনি' ব্রাহ্মণ। ও বলতো, জাত তো গেছেই মনে মনে। সে তো আর জাত পাত, দেশ-বিদেশ, ধর্ম-বর্ণ বোঝে না। ভালোবাসার জন্যই ভালোবাসে।

ঠাট্টা করে বলতাম, মানেটা কী হলো?

বলতো, ভালোবাসার মানে বোঝো? গভীর চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলতো।

-বলো না শুনি?

-আকাশ। ভালোবাসা মানে, পুরো আকাশ। যার কোনো দিক নেই, শুরু নেই, শেষ নেই। যেখান থেকেই তাকাও, সে তোমার।

হেসে আহল্লাদে ওর গায়ে ঢলে পড়তাম। কখনও আমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকতো। বলতো, উপায় থাকলে তোমাকে বিয়ে করতাম। সারারাত গান শুনতাম প্রিয় মুখ থেকে।

-ঘুমোতে কখন?

-ঘুমোতাম না।

-পাগলের মতো কথা বলছো গো।

-যা খুশি বলতে পার প্রিয়জন। আমার কথা আমি বললাম।

একদিন ভগবান রজনীশ-এর আশ্রমে যেতে চাইলাম। পুনেতে তখন রজনীশ-এর "সেক্স টু গড" ধর্ম দারুণভাবে তরুণ সমাজকে আকৃষ্ট করছে। তার আশ্রমে দেশি-বিদেশি নারী পুরুষ যুবকেরা আসছে। ওরা সবাই গেরুয়া কাপড় পরে চলা ফেরা করে। মুঠা নদীর একপারে ডেকান কলেজ, অন্য পারে রজনীশের আখড়া। গরমের সময় ছেলেরা একটুকরা কাপড়ের নেংটি ছাড়া কিছু পরতো না। ডেকান কলেজের পাশ থেকেই দেখা যেতো এই সব দৃশ্য। লজ্জাও পেতাম, হাসতামও।

তো আমাকে কিছুতেই যেতে দেবে না ও। ওখানে গেলে নাকি কেউ ফিরতে পারে না। কতোবার বলেছি, দুজনেই যাই একসাথে। তাতেও রাজি না। ফলে রজনীশ-এর আশ্রম দেখাই হলো না। আফসোস হয়। রাগও হয়। আমাকে হারানোর সে কী ভয়! আমি যতোই হাসি, ও ততোই মুখ মলিন করে। আহা, কী সুন্দর সময় ছিলো আমাদের! ডেকান কলেজের থাই ছাত্রী, মাঞ্চেরি আমাদের বলতো, মানিক জোড়।

মনে পড়ছে এখন। প্রিয়জন বলার মানুষ আমার জীবনে একজনই। নিশ্চয় সেই 'চিতপাবনি' ব্রাহ্মণই হবে। সেই পাগলটাই। নইলে এমন করে জোর দিয়ে নিঃসঙ্কোচে আর কে বার্লিন যাওয়ার কথা বলতে পারবে?

কিন্তু ওর কোনো চিঠি তো পাইনি? ওর যে জার্মানি আসার কথা ছিলো, সেটাই তো আমি জানিনি। লজ্জাই লাগছে এখন। কী মনে করলো ব্রাহ্মণ?

আজকাল স্মার্ট ফোনে তো কল ব্যাক করা যায় সহজেই। তাড়াতাড়ি ফোনটা হাতে নিই। আবার ভাবি, থাক না সে সাসপেন্সে। আমি চিনতে পারিনি, এটা ভেবেই থাক।

হয়তো কষ্ট পাবে একটু। পাক না। দেখা হলে সব মেঘ কেটে যাবে।

সিদ্ধান্ত নিই বার্লিন যাওয়ার। গোলম থেকে বার্লিন যাওয়া খুবই সহজ। গিয়েছি দুতিন বার। কিন্তু একা যাইনি কখনও। গোলম থেকে এক ট্রেনেই যাওয়া যায়। কিন্তু অনেক খানি হাঁটতে হবে। আজকাল হাঁটতে বেশ কষ্ট হয়। তার চেয়ে ভালো, বাসে করে পটসডাম মেইন রেলস্টেশনে গিয়ে বার্লিনের ট্রেন ধরা।

বেলা এগারোটায় বার্লিনে পৌঁছুতে পারি, এমন সময়ের ট্রেন দেখে রাখলাম। কী অস্থিরতা! সকাল কাটে তো বিকেল কাটে না। রাত কাটে

তো দিন কাটে না। সব প্রতীক্ষাই বুঝি এমনি হয়। আহা, কতোদিন পর দেখা হবে! কেবল সময়ের হিসাব করছি। পটসডাম থেকে কিছু ফুল নিতে হবে। লাল গোলাপ নিলে বেশি রোমান্টিক হবে। কয়েক রকম গোলাপ নেয়াই ভালো। সেই যে হায়দ্রাবাদ গিয়েছিলাম, তখন একদিনের জন্য পুনেতে গিয়ে দেখা করেছিলাম। রাতের ট্রেনে হায়দ্রাবাদ থেকে পুনে, আবার পরের দিন সন্ধের ট্রেনে পুনে থেকে হায়দ্রাবাদ।

একটা পুরো দিন অটোরিকশায় ঘুরেছিলাম আমরা দুজন। লম্বা এম জি রোডের এই প্রান্ত ঐ প্রান্ত ঘুরে ফিরে খেলাম সেই পুরনো রেস্তোঁরায়। কস্তুরবা সোসাইটিতে সেন দাদার বাসায় গেলাম। খাওয়া হলো সেখানেও কিছু। আমার গুণি গাইড ড. কেলকার স্যারের বাসায় গেলাম। কোথা দিয়ে বারো ঘণ্টা কেটে গেলো, বুঝিনি। সন্ধে বেলায় পুনে রেল স্টেশনে গাড়িতে তুলে দিয়ে বিদায় নিলো ও। হাতটা ধরেই ছিলো ট্রেন চলতে শুরু করার আগ পর্যন্ত। ঠিকই তো, সতরো বছর আগের কথা। একটা প্রজন্মের ব্যবধান বলতে গেলে। আহা জীবন! কী অনায়াসে বয়ে যাও সময়ের রথে বসেই!

দশটা আটান্ন মিনিটে ট্রেনটা বার্লিন মেইন স্টেশনের চোর্দ্দ নম্বর প্লাটফর্মে থামলো। বুক ধুক ধুক করছে আমার। চিনতে পারবো তো ওকে? স্টেশন তো নয়, এলাহি কারবার। যেমন ভালো লাগে, তেমন আউলা লাগে। প্রতি এক দুমিনিট পর পর মাথার ওপরে আশে পাশে ট্রেনের পর ট্রেন আসা যাওয়া করছে। ছুটির দিনে থৈ থৈ করে লোক। আজ কিছু কম মনে হলো। তবু অনেক। যে যার গন্তব্যে ব্যস্ত। কারও সাথে হাই, হ্যালো নেই। তাই কথার উচ্চ গুঞ্জনও নেই। জনারণ্যে সবাই একা পথিক। কথা যা, তা স্মার্ট ফোনের সাথে। মেশিনে টিকিট কেটে নিচ্ছে কেউ কেউ। সেখানেও কথা নেই। সময়ের আকাল তো আছেই। কথারও আকাল আছে মনে হয়। হাত ধরে যে সব জুটি হাঁটে, তারা মাঝে মাঝেই পরস্পরকে চুমু খায়। জড়িয়ে ধরে। যেনো চারপাশে ভুবনের আর কোনো বাসিন্দা থাকে না। হোমো, লেসবিয়ন, সবই দেখা যায়। ফিরেও চায় না কেউ।

ট্রেন থেকে নেমে একটু এদিক ওদিক দেখলাম। দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভ্রান্তি কিছুই থাকার কথা নয় এখানে। কাঁটায় কাঁটায় ট্রেন আসবে। সাধারণত নির্ধারিত প্লাটফর্মে থামবে। ও নিশ্চয় জানে, এগারোটার 'রিজিওনাল বান' (ট্রেন) কোন্ প্লাটফর্মে থামবে। তবে আমাকে নিচে নামতে হবে। ম্যাকডোনাল্ডস

মনে হয় তিন তলায়। সেই কবে একবার এসেছিলাম, কিছুই মনে নেই। গোলোক ধাঁধার মতো লাগছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই লিফটের দিকে।

আস্তে করে হাঁটছি। পাঁচ তলার ওপর প্লাটফর্ম। কী বাতাস! পুরো স্টেশনটা একটা উপগ্রহের মতো। ঝড় বৃষ্টি রোদ কিছুই লাগে না। তবু ঠাণ্ডা লাগছে আমার। পাতলা সোয়েটার গায়ে থাকার পরও শালটা জড়াতে হলো। সামনেই লিফট। দাঁড়ালাম। যন্ত্রটা মানুষ পেটে নিয়ে ওপরে উঠছে। সিঁড়ি আছে। ইলেভেটর আছে। কিন্তু আমি লিফটেই যাবো। যন্ত্রটা এসে থামলো। মানুষগুলো নামছে।

হঠাৎ পেছন থেকে দুটো উষ্ণ হাত আমাকে জড়িয়ে ধরলো। চমকে ঘুরে দাঁড়ালাম। দুজন দুজনকে এক ঝলক দেখে জড়িয়ে ধরলাম পরস্পরকে আবার। আহ, কতোদিন পর! কী শান্তি! কী শান্তি! শেষ হলো প্রতীক্ষার প্রহর।

আবেগ সামলে ঠিকঠাক দাঁড়ালাম মুখোমুখি। ও হেসে বললো, চিনতে পেরেছো?

-খুব ভালো করে। সব মনে পড়েছিলো সেদিনই।

-ফোন করোনি কেন?

-তোমাকে সাসপেন্সে রাখার জন্য। হাসলাম দুজনেই।

-খুব শুকিয়ে গেছো তুমি। চোখের ওপর চোখ রেখে বলে ও।

-না তো! হেসে বলি, সতরো বছর সময় তো কম নয়। কিন্তু এরই মধ্যে কালো চুলগুলো পাকিয়ে ফেলেছো। পড়েও গেছে কুন্তল রাশি অনেক।

-খারাপ লাগছে দেখতে, না?

আবার জড়িয়ে ধরি ওকে, বলি, বৌদি, আমার পর্ণা বৌদি। কী বলো এসব?

-দিদিভাই। কান্না জড়ানো কণ্ঠে ও বলে, অহনাদি, আমার প্রাণের দিদি।

আমাদের দুজনের চোখেই পানির ধারা। পর্ণা বৌদি বললো, দেখা হলো অবশেষে অহনা দি।

-সত্যি। নিজ দেশে নয়। একেবারে ভিনদেশে। বাংলাদেশ নয়, ভারত নয়, সুদূর জার্মানিতে। একেই বলে ভালোবাসা বৌদি। অবিশ্বাস্য।

খাওয়া দাওয়া কখন করবো? ম্যাকডোনাল্ডসে ভিড় দেখে অন্য রেস্তোঁরায় গিয়ে এক প্লেট নুডলস নিলাম। বসলাম গিয়ে বারান্দার ধারে। ভেবেছিলাম,

পরে বার্গার খেয়ে নেবো। চিতপাবনি ব্রাহ্মণ আবার এক প্লেটে আমার সাথে খেলো। কই খেলাম, বলতে পারি না। প্লেটের খাবার কমছে না, কিন্তু সময় কমে যাচ্ছে। মনে হয়, দুই মিনিটে উড়ে গেলো দুই ঘণ্টা সময়। বৌদিকে ফিরতে হবে হামবুর্গ। ফেরত টিকেট কাটা আছে।

স্টেশন থেকে দেখা যাচ্ছিলো স্প্রি নদীর ওপর নির্মিত সুরম্য জার্মান সংসদ ভবন। একবার এসেছিলাম ছেলের সাথে বেশ কয়েক বছর আগে। তখন 'চেক পয়েন্ট চার্লি' এবং জার্মানির ভাঙা দেয়ালও দেখেছি। আহারে জীবন! ছোট্ট আয়ুতে কী বড়ো চৌহদ্দি! কেউ কি সবটুকু দেখতে পারে? মোচড় দিয়ে ওঠে বুকের ভেতর।

রেস্তোঁরায় অনেক লোক। তবে এরা সবাই 'চুপ শা'-এর শিষ্য। হয় মৃদু স্বরে কথা বলে, নয়তো চুপচাপ খায়। কিছুই আমাদের আকৃষ্ট করলো না। আমরা ডুবে গেলাম শীর্ণ সেই মুঠা নদীর অগভীর জলে। তারপর কথার অবগাহন। কতো কথা বললাম, তার হিসাব নেই। সতরো বছরের তৃষ্ণা! আকণ্ঠ শুকিয়েই থাকলো, বিদায়ের সময় হয়ে গেলো। ভাবতেই পারিনি।

বৌদি ট্রেনে ওঠার আগ মহূর্ত পর্যন্ত আমরা কথাই বলে গেলাম। বিদায়ের আগে আর একবার জড়িয়ে ধরলাম পরস্পরকে। আবার কবে দেখা হবে, কে জানে? আদৌ হবে কিনা, সেটাও প্রশ্ন। জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আশা করতে সাহস হয় না। হুড়মুড় করে নয়, সাপের মতো নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো ট্রেনটা। কামরায় উঠে ঝরঝরিয়ে সেকি কান্না বৌদির। আমারও! পুনে থেকে প্রতিবার বাড়ি আসার সময় যেমন করে আমরা দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতাম, ঠিক সেইরকম কান্না। কে জানে আমাদেরকে লেসবিয়ন মনে করছে কিনা অন্যেরা? এদেশে তো লেসবিয়নেরা আইনত বিয়েও করতে পারে। দূর, কী যায় আসে আমাদের?

ট্রেন যেমন পিলপিলিয়ে আসে, তেমন পিলপিলিয়ে যায়। শব্দ নেই তারও। যেনো লুকিয়ে লুকিয়ে পরকীয়ায় আসে যায়। বাড়ি ফিরবো আমিও। লুকিয়ে লুকিয়ে মন খারাপ করবো। জানতে পারবে না কেউ। আমাদের এক আকাশ ভালোবাসার কথাও তো জানবে না কেউ। অনেকেই ভাবে, এই বয়সে মানুষের সুকুমার বোধ, বুদ্ধি, আবেগ, কিছুই থাকে না। কথাটা কিন্তু একেবারেই বেঠিক। মনটা আমার খুলে খুলে যাচ্ছে অল্পবয়সী প্রেমিকের মতো। কথা বলতে পারিনি কেউ শেষ মুহূর্তে।

ব্রাহ্মের সাথে আমার এই বন্ধুত্বের কথা কেউ বুঝতেই পারে না।

হুইসেল বেজে উঠলো। হাত ছেড়ে দিয়েছিলাম আগেই। ব্যাগ থেকে টিসু পেপার বের করে চোখ মুছে দেখি, জানান না দিয়ে, কোনো শব্দ না করে, বিদায় বাণী উচ্চারণ করতে না দিয়ে অসভ্য নির্বিকার ট্রেনটা চলে যাচ্ছে তার গন্তব্যে। সময় মতো প্লাটফর্ম না ছাড়লে যেনো বার্লিন উলটে যাবে।

শক্ত বিশাল পাটাতনের ও পাশেই পনরো নম্বর প্লাটফর্ম। নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো আমার ট্রেনও। এই আসা যাওয়ার পৃথিবীতে এবার গন্তব্যে যেতে হবে আমাকেও।

পূর্বরাগ এবং তারপর

মাথা খারাপ হয়ে যায় মইনের । বন্ধু বান্ধব তার কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়। অহনা বলে, বুঝলো না বিষয়টা। এটা একটা কথা হলো? প্রথম প্রথম হাসাহাসি চলতো। দুজনের পরিচয় পর্বে তো বেশ বুঝতো কবিতা। এখন কী হয়েছে? ক্রমেই মইন চটে মনে মনে। সত্যি বোঝে না, নাকি দুষ্টুমি করে অহনা। এটাও ভাবায় তাকে। আবার ভাবে, ব্যক্তিগত জীবনে কবিতা টেনে না আনাই ভালো। অঙ্কের ছাত্রী বৌটা। তার বিষয় নিয়ে ভালোই থাকে। থাক।

বড়োলোকের মেয়ে, একটু আল্লাদি। এই আর কী! আসলে সরল সহজ বলে বুদ্ধি কম নয় অহনার। অংকে মাথা সরস। সেদিকে মইন গোল্লা। সেটা কাটানোর জন্যই হয়তো ওকে বোকা মনে করে মইন আমোদ পায়। সামনে বলার সাহস নেই, তাই মনে মনে কচলায়। নিজেই আবার সামলে নেয়। আবার কখনও লেগেও পড়ে দুটিতে। ভুলে যায় পূর্বরাগের মিঠে মিঠে কথা। ঘুড়ি তবু কাটে না। বাঁধা থাকে নাটাইয়ে সুতোর সাথে। বেশ ভালোই আছে ওরা।

এখন আবার ন্যানো সেকেন্ডের অঙ্ক নিয়ে বই লিখছে অহনা। মহাব্যস্ত তাই নিয়ে। ফেব্রুয়ারি মাস এসেছে। বইমেলা চলছে। মইনের কবিতার বই বের হয়েছে। সেটা বিক্রিও হচ্ছে ভালো। আজকাল-এর প্রকাশক শামসুল মনির বইয়ের মোড়ক উন্মোচনের অনুষ্ঠান করলো বেশ আয়োজন করে। টিভি চ্যানেলের লোক এসে ছবি নিলো। তাৎক্ষণিক একটা সাক্ষাৎকারও নিলো মইনের এক সাংবাদিক বন্ধু জহুর আলি।

এতো সবের কিছুই জানে না অহনা। সে অবশ্য আগেই বলেছিলো, ১৫ই জানুয়ারি থেকে ১৬ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সে কোনো দিকে মন দিতে পারবে না। ঘর সংসারের অপরিহার্য কাজ ছাড়া মইনকে সঙ্গ দেয়া যাবে না বিধায়

ক্ষমাপ্রার্থি। এমনকি, ভ্যালেন্টিন্স-ডে উপলক্ষে ১৬ই ফেব্রুয়ারি টিএসসি-তে মইনের কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানেও তার থাকার উপায় নেই। রীতিমতো বোঝাপড়ার ব্যাপার। তবু মইনের খারাপ লাগছে, বিধুমুখি বউটা পাশে না থাকার কারণে। খারাপ লাগছে অহনারও। আহা! প্রথম পরিচয়ের দিনগুলো কী ভালো ছিলো! কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতেই পারতো না।

অহনা সত্যি ব্যস্ত। সম্পাদনা চলছে তার বইয়ের। বোর্ডের বই বলে কথা! এইসব কাজের জন্য মানুষ ওন্দা বেড়ালের মতো ছোঁক ছোঁক করে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেছনে ফেলে সাধারণ স্কুল শিক্ষক অহনার ভাগ্যেই ছিঁড়েছে শিকেটা। তাতে কলিজা জ্বলছে কতো জনের। ভালো পারিশ্রমিকের ব্যাপারও অনেকের হিংসের কার।

প্রকাশক শামসুল মনির ওরফে শামসু ভাই আর সাংবাদিক জহুর ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়েছে অহনা। অনেক করেছে ওরা মইনের জন্য। তাই প্রাক ভ্যালেন্টিন সন্ধেতে মইন একটা আড্ডার আয়োজন করেছে। সেদিন সন্ধেতে সময় দিতে পারবে অহনা। মইনের জন্য এসব তাকে করতে হয়। ভালোও লাগে। এবারই সময় কম। মইন সেটা বুঝেছে।

সাধারণত জানুয়ারি মাস থেকে শুরু হয় বিভিন্ন লেখক দলের বিশেষ আড্ডা অনুষ্ঠান। হোটেল বা ঢাকা ক্লাব বা গুলশান বনানি উত্তরা ক্লাবে বসে ঘনো ঘনো আড্ডার আসর। অর্থে-বিত্তে যারা ওদের সমগোত্রের না, তারা পালা করে নিজেদের বাড়িতেই বন্ধুদের আড্ডায় আপ্যায়ন করে। মইনেরও দল আছে। তার কবি এবং গদ্যিক বন্ধুর পরিধিও বেশ বড়ো। তবু সবাইকে ডাকে না সে বাড়িতে। পেরে ওঠে না। খরচের চেয়ে বড়ো হলো আয়োজনের ধকল।

এবার মাত্র বিশ জনের মতো বন্ধু আসবে। ফেব্রুয়ারিতে একটা আড্ডা না হলে চলে? বরাবর সংখ্যা বেড়ে যায় আড্ডায়। কারণ অনাহুত কেউ কেউ এসেই পড়ে। আড্ডায় চারজন মহিলা লেখক আসবে। সবাই কবি। সবাই মইনের ভক্ত। নতুন যে কবিতার বই বের হয়েছে মইনের, সেটা থেকে পাঠ থাকবে আড্ডায়। একজন মহিলা কবি এবং একজন পুরুষ কবি একটা করে কবিতা পাঠ করবে। অনুষ্ঠান সাজিয়েছে জহুর ভাই। কথা আছে, উনি একজন বন্ধু আনবেন। নাম হাসনাইন মুর্শেদ। সদ্য শুরু হওয়া নতুন এক টিভি চ্যানেলের নিউজ ডেস্কের অন্যতম কর্মকর্তা। ভালো কভারেজ পাওয়া যাবে। প্রচারের দাম আছে না?

অহনা আজকাল আর রান্না করা খাবার পরিবেশন করে না পার্টিতে। সময় পায় না রান্নার। তাছাড়া অনেক রকম দোকানও হয়েছে অর্ডার নেয়ার। বললেই দিয়ে যাবে। চাইলে খাবার পরিবেশন করবে পরিপাটি ভাবে। সবই টাকার ব্যাপার। আরাম কেনার বিষয়। শেষে সব পরিস্কারও করে দিয়ে যাবে। রান্নার গুণ ও মান বেশ ভালো। মইনও পছন্দ করে কেনা খাবার।

অহনা চেয়েছিলো পরাটা, কাবাব, সালাদ হবে প্রধান খাবার। পরে দই, মিষ্টি পান। শেষে গ্রিন টি। কিন্তু মইনের বন্ধুরা খাশির বিরিয়ানির ভক্ত। সাথে গলদা চিংড়ির মালাইকারি আর সালাদ। সবজি একটা থাকবে। অনেকের পছন্দ। শেষে দই মিষ্টি পান তো থাকবেই। একটা কোণায় কিছু বোতল সাজানো থাকবে। প্রেস্টিজিয়াস কর্নার।

সন্ধে হতে না হতে ফুল হাতে বন্ধুরা আসতে শুরু করলো। বসার ঘরে কার্পেট বিছিয়ে বসার ব্যবস্থা। মইন উস্খুস করে জহুর ভাইকে না দেখে। টিভির কর্মকর্তাকে নিয়ে আসার কথা। সাথে আসবে ক্যামেরা ম্যান। কর্তাব্যক্তির কভারেজ দেয়াই তাদের চাকরি। মইন ফোনেই দাওয়াত দিয়েছে। কবি নাবিলা কনা মইনের কবিতার বই নিয়ে বসেছে। পাঠের আগে পড়া দরকার। মলয় রায়েরও পাঠ আছে। কিন্তু সে সাজিদের সাথে চলে গেছে সেই প্রেস্টিজিয়াস কর্নারে।

হুড়মুড় করে জহুর ভাই এলেন দুজনকে সাথে নিয়ে। এই না হলে জহুর ভাই? নিয়ম ভাঙার গানেই বাজিমাত করেন সব সময়। টিভির কর্মকর্তার সাথে টিভি চ্যানেলের মালিক কলিম শাহকেও এনেছেন। নামি দামি লোক তো বটেই, বিশাল ধনি আদম। আয়ের উৎস ব্যবসা। সংসদ সদস্য হতে চেয়েছিলেন সতন্ত্র প্রার্থী হিসেব। সুজোগ পেয়েছিলেনও। কিন্তু জিতে আসতে পারেননি। বলে বেড়ান, আগের রাতেই বাক্সে ব্যালট ভরা হয়েছিলো। ইলেকশন বা সিলেকশন নয়, ডিসিশনেই কাজ হয়েছে।

এক দফা ছোটো ছোটো সামুসা আর সিঙাড়া খাওয়া হয়েছে। চা বা কফি নিচ্ছে সবাই। এসপ্রেসো আছে, ইচ্ছে হলে কেউ নিতে পারে। মহিলারা চা নিয়েছে। কফি নিতে গিয়ে থামতে হলো অহনাকে। জহুর ভাইয়ের সাথে একজন অপরিচিত মানুষ দেখে কফির জায়গা থেকে সরে আসে।

-না না ঠিক আছে, আপনি আগে নেন। নতুন ভদ্রলোক বলেন।

জহুরভাই এগিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দেন, অহনা, ইনি হলেন আমাদের প্রিয় কলিম শাহ ভাই। সাহিত্যের সমঝদার। আড্ডার কথা শুনে চলে এলেন।

হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন কলিম শাহ। অহনা মুখে মুখে বললো, স্লামালেকুম। খুব ভালো করেছেন এসে।

-স্লালেকুম স্লালেকুম। আমি কলিম। সপ্রতিভ মানুষ। সামলে নিলেন।

-আমি অহনা মইন।

-ও, আপনি সেই ভাগ্যবান কবিপত্নি? খুশি হলাম পরিচিত হয়ে।

-কী দেবো আপনাকে? শ্রীময়ি অহনা হাসে মিষ্টি করে।

-ব্যাস্ত হবেন না আমার জন্য। এই নেবো যা হোক কিছু।

পারফিউমের গন্ধে আমোদিত করে দিয়েছেন কলিম শাহ। একটা সময় ছিলো, ইনটিমেটের সুবাস ছড়িয়ে আভিজাত্য বোঝানো হতো। শ্যানেল তো বরাবরই উঁচু তলার সৌখিনদের সুবাস। এখন আরও কত রকম নামের সুবাস আছে। অহনা মইন দুজনেই সুবাস মাখতে পছন্দ করে।

কী সুবাস মেখেছেন কলিম শাহ! বেশ আসর মাতানো এবং উগ্র। বয়স হয়েছে, কিন্তু খুব স্মার্ট। দেখতেও আকর্ষণীয়।

মইন এসে কলিমকে এসপ্রেসো নেয়ার কথা বললো।

-ওই কর্নারটা একটু দেখে আসি চলেন। কলিম বলেন, আসেন জহুর আমরা ঐদিকে একটু ঘুরে আসি।

হঠাৎ ঘুরে অহনার দিকে তাকিয়ে বলে, আচ্ছা, শাহজামাল চৌধুরী কি আপনাদের কেউ হন?

-আমার বাবা।

-তাই বলি, কোথায় দেখেছি আপনাকে!

-মানে? বুঝতে পারলাম না।

-বছর দশেক আগে ব্যাংকক হাসপাতালে আপনার মায়ের চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন কি?

-আপনি জানলেন কী করে?

-আমি তখন সেই হাসপাতালে ছোটো মেয়ের চিকিৎসার জন্য ছিলাম।

-আমার মনে পড়ে না কিছু।

-আপনাকে দেখতাম মায়ের কাছে বসে দোয়ার বই পড়তে। অবিকল বাবার চেহারা। ভালো লাগতো দেখে। পাশের কেবিনটাই ছিলো আমাদের। মাঝে মাঝে ক্যান্টিনে দেখা হতো।

-এখনও মনে পড়ে না কিছু। দুঃখিত।

-না পড়ারই কথা। আমি নগন্য মানুষ।

-এমন করে বলবেন না প্লিজ। আজ আমাদের সম্মানিত অতিথি আপনি।

-আপনার বাবার সাথে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিলো। আপনাকে দেখলে আপনার বাবাকে মনে পড়বেই। একেবারে কাট টু কাট ফেইস।

অহনা কথা বলে না, মাথা নামায় লজ্জায়।

-ভেবেছিলাম, যোগাযোগ রাখবো। কিন্তু ব্যস্ত জীবনে যা হয়। আমি চলে গেলাম চট্টগ্রাম। আপনারা তো ঢাকার বাসিন্দা। তবে আপনার বাবার সাথে দেখা হয় মাঝে সাঝে রোটারি ক্লাবের বার্ষিক সভায়।

সল্পভাষি অহনা কথা খুঁজে পায় না। কেমন অস্বস্তি লাগতে থাকে। সময় পর্ব তার মনে আছে। বাকি অনেক কিছুই ভুলে গেছে বেমালুম। মাকে হারানোর দিশেহারা শোকে মুছে গিয়েছিলো পৃথিবী। মন খারাপ হয় তার। এমন দিনে সাজানো আড্ডার সুখি সুখি আয়োজনের মঞ্চ থেকে কে যেনো হঠাৎ তাকে ফেলে দিলো বিষণ্ন শোকের দহে।

ওদিকে কবিতা পাঠের পর্ব শুরু হবে বলে মইনকে ডাকাডাকি শুরু হয়েছে। নাবিলা বই হাতে নিয়ে বসে আছে। অহনাকে যেতে হয় সেদিকে। মহিলাদের চা শেষ। কাপগুলো সরিয়ে রাখে ক্যাটারিং সার্ভিসের দুটো ছেলে। কলিম সাহেব তো মক্ষিরাজা হয়ে ঘুরছেন। জহুর ভাইকে ছাড়ছেন না কলিম সাহেব, না জহুর ভাই ছাড়ছেন না কলিম শাহকে, বোঝে না অহনা। সামান্য ঘোষণার ব্যাপার আছে না? আড্ডাটাই না মাটি হয়।

নাবিলার পাঠ শুরু হলো। বেশ ভালোই পড়লো। আঠারো লাইনের ছোটো কবিতা। শিরোনাম, বসন্তের পাখি।

বাহবা বাহবা নন্দলাল বলার লোক তো থাকেই আড্ডাতে। তারা খুব বাহারে বাহারে বাহা করে উঠলো। অহনা কবিতার তেমন কিছু বুঝতে

পারেনি। ছন্দের কবিতা তার পছন্দ। গদ্য কবিতা একটুও ভালো লাগে না। মইনের সব কবিতাই গদ্যছন্দের। মাঝে মাঝে অনুচ্ছেদের মতো করেও কবিতা লেখে। বহুবার পড়ে চেষ্টা করেছে ভালো লাগাতে, কিন্তু পারেনি। খারাপই লাগে মইনের কবিতার ভালো পাঠক হতে না পেরে। বিয়ের আগে কি সত্যি ভালো লাগতো মইনের কবিতা? নাকি সুন্দর মানুষটাকেই বেশি ভালো লাগতো? প্রায়ই ভাবে কথাটা অহনা।

একজন বললো, বসন্তের দূত হলো কোকিল। এখানে দোয়েল, শ্যামা, ফিঙে, কাক, চিল পর্যন্ত আছে, কোকিলের নামটা থাকলে ভালো হতো।

-কোকিল ছাড়া বসন্ত আসে না? এক তরুণ কবি প্রশ্ন করে কথককে।

-নিশ্চয় আসে। ফুল না ফুটলেও বসন্ত আসে।

-তাহলে?

-কী তাহলে?

-কোকিলের নাম না শুনে কষ্ট পেলেন মনে হলো।

-কষ্ট পাবো কেনো? অপ্রস্তুত হয় প্রথম কথক।

আর এক তরুণ কবি বললো, কবিদের কাব্যসত্য অন্য জিনিষ।

-একটু ভেঙে বলেন ভাই। অন্য কণ্ঠ শোনা গেলো।

-এই যেমন, রোদের গন্ধ, বারুদের গান, বেনোজলের ঘোড়া, শিশিরের শোক, গোধুলির দীর্ঘশ্বাস, নিরবতার অট্টরোল, আঁধারের শিখা, আকাশের ডানা, ইত্যাদি শব্দগুচ্ছের মধ্যে কবিরা এমন কিছু বলতে চান, যা অন্যেরা বোঝে না সহজে।

কেউ কেউ হেসে ওঠে তরুণ কবির গড়গড় করে শব্দগুলো বলার জন্য।

অন্য কণ্ঠ আবার বলে, একালেও জীবনানন্দ জ্বালাতন করবে?

- বলেন কি দুদু ভাই? জীবনানন্দকে ভালো না বাসলে কবি হবেন কী করে? আশিকুল হক পটল বলে জোশের সাথে।

- আমি তো কবি নই, একটু আধটু ছড়া লেখি।

- ছড়া কি কবিতা নয়?

- কবিতা বলেই মানি। খুব সহজ কথা আমার পছন্দ। ভারি কথা, ভারি দর্শন, বিস্ময়কর রোমান্স, এসব বুঝি না বললেই চলে পটল ভাই।

- আমাকে আশিক বললে খুশি হবো।

- এতোকালের অভ্যেস কিনা। মুখে এসে যায় ডাকটা।

- তাই বলে অনুষ্ঠানের মধ্যে?

- আপনিও তো আমাকে দুদু ভাই বলেছেন।

- আপনি আপত্তি করেননি তো!

ঝাঁকড়া চুলের একজন বললো, আহা আহা পার্সোনাল এসপার্শান হয়ে যাচ্ছে ভাই। কবিতার পাখি নিয়ে বেশ তো চলছিলো আলোচনা। পাখির সাথেই থাকেন কবি ভাইয়েরা। ওড়া যাক কিছুক্ষণ।

-আরে ভাই, জীবনানন্দ যে হওয়া যায় না, সেটা না বুঝেই অনেকে এবড়ো থেবড়ো করে দেয় কবিতার দেহ, একজন গদ্যিক বলেন কথাগুলো।

ঘরের এক কোণায় মহিলারা কলিম শাহকে নিয়ে কৌতহলি হয়ে ওঠে। কবিতার আলোচনায় তারা যাবে একটু পরে। মলয় পড়বে রোমান্টিক কবিতা 'ক্লিওপেট্রা'। সেখানে অংশ নিতে চায় মহিলারা। সকলেরই বেশ পছন্দ কবিতাটা। একটা দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছিলো। তখনই সাড়া পড়ে গিয়েছিলো তাদের দলের মধ্যে।

নাবিলা নিচু সরে বলে, ভদ্রলোকের চোখ দুটো খুব রোমান্টিক।

-কোন্ ভদ্রলোক? পিকু জানতে চায়।

-কলিম সাহেবের কথা বলছি। যদিও বয়স হয়েছে।

-হয়তো ব্যক্তিগত জীবনেও রোমান্টিক। ময়না মুচকি হেসে বলে।

-চোখ দেখে কিছু বলা অতো সহজ নয়। মলি বেশ জোর দিয়ে বলে।

-এমন মনে করার কারণ? ময়না জানতে চায়।

-যেমন ধরেন লাদেন। তার সুর্মা দেয়া মায়া মায়া চোখ দেখে তাকেও তো রোমান্টিক মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে কি তাই? মলি নাটুকে ভঙ্গিতে কথা বলে।

কোথায় কবিতার আসর, আড্ডা, কোথায় লাদেনের চোখ? নিজেরাই নিজেদের কথায় হেসে ওঠে। একটু জোরেই হাসির শব্দ হয়। আলোচনার

আমেজ হালকা করে দেয় বামা কণ্ঠের হাসি। অনেকেই ফিরে তাকায় মহিলাদের দিকে। অভদ্রতার একটা সংকোচ জড়িয়ে ধরে সবাইকে।

-মেয়েরা মেয়েই হয়। জাহাঙ্গির হাসতে হাসতে বলে, এদিকে বসন্তের পাখি পালিয়ে গেছে, তার খোঁজ পেলেন না আপনারা।

-কে বলে পালিয়েছে? চারুবাক মলি উত্তর দেয়, পাখি এখনও কবিতায় বন্দি। আপনারা তো নিজেদের নাম নিয়ে লজ্জায় পড়েছেন। পাখিও হাসছে।

-শুনেছেন তাহলে? অবাক হয় জাহাঙ্গির।

মলয় বলে, এবার আমি কবিতাটা পড়তে চাই। মেয়েরা এগিয়ে গেলো

আলোচনার কেন্দ্রে। অনেকেই নড়ে চড়ে বসে কবিতা শোনার জন্য।

বেশ আবেগ দিয়ে মলয় পাঠ করে কবিতা। কিছুক্ষণ সবাই চুপ। রগ রগে কবিতা। কাঁচুলি, স্তন, নিতম্ব, রতি, চুম্বন, আলিঙ্গন, ইত্যাদি শব্দের স্পষ্ট ব্যবহারে মহিলারা লাল হয়ে উঠেছে। তারপরে শেষ দুটি লাইনে গভীর হতাশার দীর্ঘশ্বাস। হঠাৎ শুনশান। চুপ সবাই। মনে হয়, রতি শেষে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কেউ। দীর্ঘস্বাস ফেলে বলছে,

'জীবনের গাঢ় যাপন অলিক তো বটেই, অবশ্যই
বেঁচে থাকার ঘ্রান থাকে অনিত্যেই'

নাবিলা কিছু বলেন, জাহাঙ্গির বলে।

-আহা, প্রথমেই আমি কেন জাহাঙ্গির ভাই?

-দিলি তো শালা আমেজ নষ্ট করে! মইনের এক গদ্যিক বন্ধু বলে, বেশ লাগছিলো। যদিও একটু ইয়ে, মানে...

-মদের বোতল নিয়ে কাঁদার মতো হয়ে গেলো দোস্ত, পটল সাহেব বলে।

-দুর্বোধ্য শব্দাবলি ব্যবহার করে কবিরা আত্মতঞ্চকতাই করে মইন ভাই।

-বেশ বলেছেন তো পটল ভাই। জহুর ভাই বলে, তবে আমার মনে হয়, তঞ্চকতা সৃষ্টি করাও একটা কাব্য কৌশল।

-আমাকে আশিক বলবেন প্লিজ। পটল সাহেব সিরিয়াস হন। মুখ টিপে হাসেন কেউ কেউ।

-মানুষ যেনো সহজে কবিতা বুঝতে না পারে, এই তো? পেছন থেকে একজন কথাসাহিত্যিক বলে, গদ্যে এর অবকাশ নেই।

-ঠিক বলেছেন, পাঠক রহস্যের দহে পড়ে বুঁদ হয়ে থাকে কিছুক্ষণ। না বোঝার মজাতে হারিয়ে যায় মন-প্রাণ-বাক-দৃষ্টি।

-কবিরা সেটাই চায় জহুর ভাই। তাইতো কবিতার পাঠক বেশি, লেখক বেশি, স্তাবকও বেশি।

-তা বলে গদ্যের মগ্ন পাঠক নেই, এটা ভাবার কারণ নেই কিন্তু। মলি বলে, গদ্য লেখকরাও কবিদের সাথে পাল্লা দিয়ে অনেক আদিরসাত্মক শব্দ বাক্য লেখছে এখন।

-আরে ভাই, সাহিত্য হলো কাননের ফুল। জোর করে ফোটাতে গেলে পাঁপড়ি ছিঁড়ে যায়। এটা পাল্লা পাল্লির ব্যাপার নয়। মইন, কিছু বলেন।

সবাই কথা বলছে। একের পর এক নয়। প্রায় এক সাথেই। প্রেসটিজিয়াস কর্নার থেকে উচ্চকণ্ঠ শোনা গেলো। তাদের বিষয়, লেখকদের পুরস্কারের মান। দেশে প্রচলিত সাহিত্যপুরস্কারের গুণগত এবং অর্থগতমান কোনোটাই পছন্দ নয় কলিম সাহেবের। সম্মাননা দেয়ার ফালতু চল হয়েছে একটা, সেটা ভিক্ষার চেয়ে খারাপ। উনি আগামী বছর থেকে দুটো সাহিত্য পুরস্কার দেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একটা কথাসাহিত্যে, একটা কাব্যসাহিত্যে। পুরস্কারের মান হবে পঞ্চাশ লাখ টাকা। নাম হবে 'কলিম সাহিত্য পুরস্কার'।

আড্ডার সবাই উচ্ছসিত হয়ে ওঠে কলিম সাহেবের কথা শুনে। বুকের ভেতর তোলপাড় ওঠে অনেকের। আহা, তাদের ভাগ্যে যদি শিকেটা ছেঁড়ে! সাহিত্যচর্চা করে এইরকম একটা পুরস্কার কার না বাসনার বিষয়! কেউ কেউ বললো, সত্যি সাহিত্যের সমঝদার লোক বটে! দিলদারও।

একটা ফোন এলো অহনার। বাড়িতে অনুষ্ঠান আছে জানায় অহনা। কলিম সাহেবের কথাটাও জানায়। শুনে তার বাবা হেসে বলেছে, ভোটে হেরে এবার সাহিত্যের বাজারে পুরস্কার ছেড়ে বিখ্যাত হতে চাইছে? বাবা আরও বলেছেন, 'শিং ভেঙে দামড়া বাছুরের দলে' গেলে সতর্ক থাকতে হয়। মইনকে বলিস কথাটা।

-আমরা কিন্তু উনাকে আজ দাওয়াত করিনি বাবা।

-তাতে ক্ষতি নেই। ওরা জানে কোথায় ঢুঁ মারতে হয়।

-ভয় ধরিয়ে দিলে।

-কিছুটা তো বটেই। ব্যাঙ্কে কোটি কোটি টাকা ঋণের দায়ে মামলা ঝুলছে ঘাড়ের ওপর।

-কী বলছো বাবা?

-সত্যি কথা মা। জামিনে আছেন এখন। জামিনে থেকে পুরস্কার দিচ্ছেন উনি। হাসি পায় রে মা।

-ভাবতেই পারছি না বাবা।

-এখন রোটারি করছেন বড়ো ধান্দায়। টিভি চ্যানেল তো নিয়েছেনই। শুনেছি একটা দৈনিক পত্রিকাও প্রকাশ করবেন এবং এরই মধ্যে এক রাজনৈতিক নেতাকে তার সম্পাদকও করে ফেলেছেন।

-জিনিস বাবা, যাই বলো।

-হা হা হা, এইরকম জিনিয়াসের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে কিনা।

জহুর সাহেব অহনাকে খুঁজতে খুঁজতে এসে আবিস্কার করলো, সে কথা বলছে ফোনে। ভাবে, ডাকবে কিনা? কিন্তু ওদিকে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে। কলিম সাহেব আজই তাঁর নামের দামি পুরস্কারটা ঘোষণা করে দিতে চান। স্মরণীয় করে রাখতে চান আড্ডার দিনটাকে।

-অহনা, ডাকেন জহুর সাহেব।

চকিতে ফিরে তাকায় অহনা। বলে, কিছু বলবেন?

-কেল্লা ফতে অহনা। জহুরকে একটু বেতাল মনে হলো।

-মানে কী? কিসের কেল্লা ফতে জহুর ভাই?

-আর একটা খাই দাই পার্টি কবে হবে, সে কথা বলো।

-একটু ঝেড়ে কাশেন ভাই। হাতের ফোনটা বন্ধ করতেও ভুলে যায় সে। বলে, খাবার দাবার কম পড়ে যায়নি তো!

-না না, ওসব কিছু না।

-তাহলে? ফোন বন্ধ করে অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

-কলিম সাহেব আড্ডার আসরে আমাদের কবি মইনকে আগামী বছরে পঞ্চাশ লাখ টাকার পুরস্কারটা দেয়ার ঘোষণা করে দিয়েছেন। আজই রাত এগারোটার খবরে তা প্রচারিত হয়ে যাবে কয়েকটা টিভি চ্যানেলে। জহুর ভাই ছুটে গেলেন অন্যদিকে। খুশির সীমা নেই তাঁর।

অহনার মনে তোলপাড়। আকস্মিক প্রাপ্তির আনন্দে না আঘাতে, বুঝতে পারছে না। ভাবছে, কলিম সাহেবের আসল পরিচয় পেলে মইন কি পুরস্কার

প্রত্যাখ্যান করবে? কিন্তু এইসব প্রভাবশালী মানুষকে খোদ সরকারই কিছু বলে না, মইন তো কোন্ ছার! আর তার বাবা? তিনিও তো ব্যবসায়ী মানুষ। ব্যাংক লেনদেনে তিনিও কি খুব স্বচ্ছ? তাছাড়া, বইপত্র ছাপানোর জন্য মইনের কিছু টাকাও দরকার। আজ সকালেই তো দুঃখ করছিলো। দুজনে আয় করেও বাড়ি গাড়ির দিকে যেতে পারেনি। টাকাটা পেলে এবার একটা ফ্ল্যাট কিনতে হবে। ডাউন পেমেন্ট হলে হয়ে যাবে বাকিটা। টাকা পয়সা নিয়ে মাঝে মাঝে খিটিমিটি লেগে যায় তাদের মধ্যে।

স্বাচ্ছন্দ দরকার জীবনে। মইন নিশ্চয় খুশি হবে। কিন্তু কোথায় সে?

হঠাৎ কানে এসে গানের সুর। প্রেসটিজিয়াস কর্নার থেকে নাবিলা আর শোয়েব গান গাইছে,

'জয় বাংলা, বাঙলার জয়...

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সবাই হঠাৎ আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো।

১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

প্রজাপতি

আজ সকাল থেকেই নানুবির পিঠের ব্যথাটা খুব বেশি। ডাক্তার বদ্যি হয়েছে অনেক, আর না। ছেলে আরমানের সাথে বাধ্য হয়ে এসেছে চট্টগ্রাম। ছোটো মেয়ে নাসিমা আর জামাই শাকিলের বাড়িতে এই তার প্রথম আসা। চাকুরে নাতি কামালের বিয়ে। কিন্তু এখানে এসেই ফেঁসে গেছে মরিয়ম বিবি। স্বামীর বাড়িতে নিজের একটা শোয়ার ঘর আছে তার। নিজের মতো করে সাজানো। হাত বাড়ালেই সব পাওয়া যায়। স্বামীর ছবিটা থাকে ঘরের পুব দেয়ালে, খাটের ডান দিকে। শুয়ে শুয়ে তাকালেই দেখা যায়।

বত্রিশ বছর ধরে সেই একই হাসি, যেমন করে সে হাসতো। ছবিতে স্বামীকে দেখার অভ্যেস খানিকটা নেশার মতো হয়ে গেছে তার। নিজের অজান্তেই চোখ চলে যায় দেয়ালের দিকে। কেমন করে ওঠে মন। একটা বড়ো শ্বাস বেরিয়ে আসে বুকের ভেতরটা ছুঁয়ে পেঁচিয়ে। এটাও অভ্যেস। শোকের আচরণিক প্রকাশ। এসব হচ্ছে না এখানে। কেমন খালি খালি লাগে। তাছাড়া নিজের ঘরের মতো আরামও নেই কোথাও। আগে বেড়াতে বেশ ভালো লাগতো। এখন সেই ভালো লাগাটা পালিয়ে থাকে। শত চেষ্টা করলেও গায়ে মনে এসে বসে না।

হঠাৎ করেই কামালের বিয়ে ঠিক হয়েছে। আর নাতির বিয়ে বলে কথা! তাই রোগ বালা ঠেলে ফেলে নানুবি এসেছে আগে আগে। নাসিমা আর জামাই খুব খুশি তাতে। মাত্র তিন দিন বাকি বিয়ের। হঠাৎ বেশ বলে কয়েই বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হচ্ছিলো। রেডিওতে বলেছিলো, ঝড় চলে যাবে উড়িষ্যার দিকে। কিন্তু ঠ্যাঁটা গেলো না চট্টগ্রামের কোল ছেড়ে। ভোর রাত থেকেই ঝির ঝিরে বৃষ্টি শুরু হলো। সকাল হবে কি? দশ দিগন্ত আঁধার করে এলো মেঘ। সারাদিনে সেই মেঘ হলো গাঢ়। বৃষ্টি বাড়লো। সাথে শোঁ শোঁ বাতাস।

সন্ধের আগেই শুরু হলো জলোচ্ছ্বাস। বিদ্যুৎ চলে গেলো। আঁধারের গলা ধরে ঝড় জলোচ্ছ্বাসের সেকি দানব নাচন সারা রাত! সাথে বজ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টি। রাত যেনো আর কাটে না। মনে হয় কয়েকদিন ধরেই রাত চলছে। সবাই সকালের জন্য উদগ্রীব। আঁধার কেটে সুর্য সকাল আসবে, এই আকুল প্রার্থনায় অনেকেই নির্ঘুম রাত কাটালেন। এক সময় দুর্যোগ থেমে গেলো। সকাল হলো। প্রসন্ন সুর্য দেখে কে বলবে, রাতে এতো আঁধার ছিলো প্রকৃতি বুকের ওপর বসে?

রেডিও খোলে জামাই শাকিল। খবরের শিরোনামেই জানা গেলো, উপকূলে মারাত্মক ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে। জেলে নৌকাসহ অনেক মানুষ নিখোঁজ। আত্মীয় স্বজনের খোঁজে মানুষ ছুটছে উপকুলের দিকে। শোনা গেলো, কমিউনিটি সেন্টারে অনেক ছিন্নমূল পরিবার রাতে আশ্রয় নিয়েছিলো। বিয়ের কিছু বাজার সদাই এবং রান্নার জন্য শুকনো কাঠ রাখা ছিলো ওখানে।

কমিউনিটি সেন্টারে রাখা জিনিসপত্রের খোঁজ নিতে এসে জানা গেলো, বাবুর্চি গেছে উপকূল অঞ্চলে পরিবারের খোঁজ করতে। না জানি কী খবর সেখানে? বিয়ের খানার বাজার যে করে দেবে, সেও ছুটেছে দেশের বাড়ি। সাতটা খাশি এনে দেয়ার কথা ছিলো বাবুর্চির ভাইয়ের। সেও চলে গেছে বাড়িতে। উপকুলে পরিবার পরিজন রেখে ওরা শহরে আসে জীবিকার জন্য। উপকূল বাসিন্দাদের জীবনে এমন ঝড় ঝাপ্টা ক্ষয়ক্ষতি কম বেশি লেগেই থাকে। বেচারাদের কিছু করার নেই। কিন্তু যাদের বিপদ, তাদের মন তো মানে না।

ঝড়ের পরদিন আমেরিকা থেকে এসে পৌঁছোলো বড়ো নাতি রাহাত। সস্তায় ফ্লাইট নিয়েছে বলে দুইদিন কয়েকটা দেশে ট্রানজিট নিয়ে থেমে থেমে এসেছে। এসে শোনে, বিয়ে পিছিয়ে দিতে হবে। মাত্র দশ দিনের ছুটি নিয়ে সে এসেছে। বিয়ের তারিখ পেছানো হবে মানে, বিয়ের উৎসব না দেখেই চলে যেতে হবে তাকে। বয়সে দেড় বছরের বড়ো হলেও খালাতো ছোটো ভাই কামালের বিয়েই আগে হচ্ছে। জানে জিগরি দোস্তি ছিলো ভাইটার সাথে। তাই অনেক ঝক্কি ঝামেলা সত্ত্বেও এসেছে সে। কিন্তু বিধি বাম! মন মেজাজ দুইই খারাপ তার।

রাহাতের মা বাবা, মানে নানুবির বড়ো মেয়ে দিলারা আর জামাই শাদাব থাকে সিলেটের হবিগঞ্জে। তারা তো জানেই দেশের হালচাল। ঝড় বৃষ্টিতে

তাদের দিকেও গাছপালা ভেঙেছে প্রচুর। বিলের পানি উপচে মাঠের ফসল ডুবে গেছে অনেকের। বাস ট্রেন বন্ধ ছিলো একদিন। সেদিনই তাদের আসার কথা ছিলো চট্টগ্রামে। যাই হোক, বিয়ে পিছিয়ে গেলে তাদের জন্য ভালোই হবে।

কথা ছিলো, রাহাতের আগেই তারা পৌঁছোবে চট্টগ্রামে। সেটা হলো না। সেজন্য নানুবির মন খারাপ। একই দেশে থেকেও মেয়ের সাথে দেখা হয়নি প্রায় চার বছর। রাহাত বিদেশে যাওয়ার বছর দেখা হয়েছিলো। আর এইবার দেখা হবে। তাও পিছিয়ে গেলো ঝড়ের জন্য। রাজশাহীর বাড়িতে থেকে গেছে ছোটো ছেলে আরমানের বউ ঝর্না। ছোটো মেয়ের আইএ পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত সে। কাজের জন্য বাঁধা একটা বুয়া আছে। রাতে তার ছেলে এসে থাকে বাড়িতে। তবু চিন্তা যায় না নানুবির। সংসার যেনো মাকড়সার জাল। একবার আটকালে বেরোবার পথ নেই।

ঝড় তো থামলো। আর এক ঝড় এলো কনের বাড়ি থেকে। তারা জানালো, এই বিয়েতে রাজি নয় কনে পক্ষ। কারণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ অশুভ ছায়া ফেলেছে। এই সম্পর্ক ভালো হতে পারে না। কোনো আলোচনা না, পরামর্শ না, এক তরফা সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে তারা। মেয়ের বাড়ির এমন ঔদ্ধত্য হজম করা মুশকিল বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে। বিয়ের বাজার হাট ছাড়াও শাড়ি গয়না কসমেটিকস জুতো এই সবের কি হবে? এ কি ছেলে খেলা নাকি? খেলবো না বললো, আর খেলা ভেঙে গেলো? বড্ড গায়ে লাগছে বর পক্ষের।

নানুবি হেঁকে বললেন, দেখা যাবে, এই মেয়ের বিয়ে হয় কোথায়? আমাদের ছেলের জন্য বৌ পাওয়া তো যাবেই। আসুক আমার বড়ো মেয়ে। এক সপ্তার মধ্যেই কামালের ঘরে বৌ তুলে আনবো। সোনার টুকরো নাতি আমার। ওর জন্য মেয়ের আকাল হবে? ভেবেছে কি ওরা? তবে মনে মনে নানুবিও কিন্তু একটু খুঁত খুঁত করছে। কিন্তু কাউকে কিছু বলে না। সত্যি তো, এতো বড়ো দুর্যোগটা হয়ে গেলো, কোনোও খারাপ কিছুর আলামত না তো? কোথায় পাবে উত্তর? সেই আলিমুল গায়েব ছাড়া কেউ জানে না কিছু। বুকের ভেতর দুরু দুরু করে তাঁর।

কামাল কিন্তু খুশি। ঢাকা ভার্সিটির যে মেয়েটাকে তার পছন্দ ছিলো, তারা নাকি বংশে ছোটো। নব্য ধনী পরিবার। তাই মা বাবা পছন্দ করেননি। এখন বেশ হয়েছে। চট্টগ্রামের এই মেয়েকে খুঁজে পেতে বের করেছেন তাঁরা

পুত্রবধু করার জন্য। রাগে দুঃখে কামাল হবু বউয়ের ছবিও দেখেনি। যা থাকে কপালে বলে সম্মতি দিয়েছে। তাতেও গেরো! কী কপাল রে বাবা!

রাহাত তার দেড় বছরের বড়ো মাত্র। দুই ভাই ভাবের চোটে নাম ধরে ডাকাডাকি করে। তুই তুই সম্বোধন। কামালের মন খারাপ দেখে রাহাত বলে, গুল্লি মার বড়োদের কথায়। বিয়ে ভাঙা এতোই সহজ? মেয়েটার সাথে কথা বলা যায় না রে কামাল?

- বলে কী হবে?

- সেটা আমি বুঝে নেবো।

- আমি তো তাকে চিনি না রে ভাই।

- চেনার দরকার কী?

- মানে? কামাল অবাক হয়।

- মানে আবার কী? নেমন্তন্ন চিঠি দেখে কনের বাড়ির ফোন নম্বর বের কর।

- কী হবে তাতে? সব তো শেষ হয়ে গেছে।

- দেখবি কি হয়। আমেরিকা থেকে আমার এক বন্ধু ভালো একটা পরামর্শ দিয়েছে।

- তোর যে কথা রাহাত। কিছুই হবে না আর। এটা আমেরিকা না।

- গাড়োলের মতো কথা বলিস না তো।

- আমি না, তুই গাড়োলের মতো কথা বলছিস রাহাত।

- এতোই পছন্দ ছিলো সেই মেয়েকে তো তার ফোন নম্বর রাখিসনি কেন?

- সেটাই তো মস্ত ভুল হয়েছে।

- ঠিক আছে। যা হওয়ার তা হয়েছে। এখন এই কুল রক্ষা করতে হবে। ভালো হতো তুই যদি মেয়েটাকে দেখতিস। কথা বলতিস।

ওদের বাড়িতে মেয়েরও মন খারাপ। বিশাল আয়োজন করেছিলো মা বাবা। সব পড়ে আছে তার শোয়ার ঘরের কোণায়। বরের শানদার পাগড়িটার দিকে সে তাকাতে পারে না। এসব কী হলো? লেখাপড়া জানা মেয়ে। ঝড় ঝঞ্ঝার সংস্কার মানে না। কিন্তু বিয়ে ভেঙে যাওয়ার একটা লজ্জা আছে। সেটাই খারাপ লাগছে তার। তাছাড়া কামাল তো কোনো দোষ করেনি। সেও করেনি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাদের কথায় আসেওনি। তাহলে এই সংস্কারের মানে কি? মা বাবাকে সেই কথা বলতেও পারছে না। এমন কি প্রাণের বন্ধু দিবা আর মিতার কাছেও বলতে পারছে না যে, এই বিয়েটাই

সে চায়। একমাস ধরে কথাবার্তা বলে তবে পাকাপাকি হয়েছে সব। কেমন মায়া পড়ে গেছে তার কামালের ওপর।

দুপুরে কনে দোলনদের বাসায় ফোন বাজে। বিয়ে ভেঙে দেয়ার তিনদিন পরে এই প্রথম ফোন এলো তাদের বাড়ি। লিভিং রুমে বান্ধবীদের নিয়ে গল্প করছিলো দোলন। সে ফোন ধরছে না দেখে মিতা ধরে।

- হ্যালো, স্লামালেকুম, মিতা বলছি।

- স্লামালেকুম। আমি রুমকি বলছি।

- কোন্ রুমকি?

- কামালের ছোটো বোন।

চমকে ওঠে মিতা। কামাল মানে বিয়ে ভেঙে যাওয়া সেই বর?

- হ্যালো, দোলন ভাবিকে দেয়া যাবে?

- মানে, দোলন তোমার ভাবি হলো কবে?

- ভাইয়ার সাথে বিয়ে ঠিক হওয়ার দিন থেকেই সে আমার ভাবি। আমি তাকে ভাবিই ডাকতাম।

ছটফট করে ওঠে মিতা। ফোনটা দোলনের হাতে দেয়।

- হ্যালো ভাবি, আমি রুমকি।

সমস্ত শরীরের রক্ত ছলকে ওঠে দোলনের।

- হ্যালো রুমকি? কান্নায় ভেঙে পড়ে দোলন।

- কেঁদো না ভাবি। তোমার সাথে আমার একটা বিশেষ কথা ছিলো। একেবারে একান্তে বলতে চাই।

- কীভাবে? কোথায়? আগ্রহ নিয়ে উছলে ওঠে দোলন।

তারপর সামান্য কথা হয় দুজনের মধ্যে। 'হ্যাঁ, ঠিক আছে, দেখি, আচ্ছা, উম, হুম,' এই রকম বললো কয়েকবার দোলন ।

দিবা আর মিতা বেশ অবাক হয়। রুমকির সাথে দোলনের কথা বার্তা হতো তাহলে? কই, বলেনি তো দোলন। ফোনের কথা শেষে আজও কিছু বললো না। কেমন চুপ হয়ে গেলো। গল্পের তাল কেটে গেলো তিনজনের। কথা শুরু করতে পারছে না কেউ। হঠাৎ দোলন বলে, তোরা তো আমার প্রাণের বন্ধু, তাই না?

- উত্তরটা কি তোর অজানা দোলন? দিবা সাথে সাথে বলে,

- কি প্রমাণ পেলে উত্তরটা হবে, তাই ভাবছি। মিতা হাসে।

- আমার পাশে থাকবি তো সব সময়?

- মনে হয় আমাদের পরিচয় হয়েছে আজই। দিবা বলে।

- কী হয়েছে বলবি তো? মিতা জোর দিয়ে বলে, তোর জন্য যা করতে বলবি, তাই করবো।

দুই বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে দোলন বলে, তিন সত্যি?

- তিন সত্যি, তিন সত্যি, তিন সত্যি...।

নিউমার্কেটে রাহাতের সাথে দেখা করতে এসেছে দোলন। এই প্রথম দেখা হবে রাহাতের সাথে। কেউ কাউকে চেনে না। তাই বলা ছিলো, কে কী পোশাক পরে আসবে, এবং কোথায় দাঁড়াবে তাও নির্ধারিত। হাতে থাকবে একটা বই।

কাজেই আনুষ্ঠানিক পরিচয়ের প্রয়োজন ছিলো না। নিশ্চিত হওয়ার ব্যাপার ছিলো। সেটাও ঠিক করা ছিলো। কাছাকাছি হলে দুজন নিজের নাম বলবে। তাই হলো।

- আমি দোলন।

- আমি রাহাত।

- স্লামালেকুম।

- স্লামালেকুম।

- চলেন, রেস্টুরেনটে বা কাফেতে বসি। রাহাত বলে।

- আমার সাথে দুই বন্ধু আছে। ডাকি তাদের?

- ওয়ান্ডারফুল! না চাইতেই বৃষ্টি। ডাকেন ডাকেন তাদের। বাঁচালেন।

- মানে বুঝলাম না।

- মানে আমি এটাই চাইছিলাম। বন্ধুরা হলো ঢাল ম্যাডাম।

কাফেতে বসে অনেক কথা বলার সময় হয়নি। যা করার চট জলদি করে ফেলতে হবে। তাই সংক্ষেপে আসল কথাগুলোই শুধু বলা হয়েছে। আবার দেখা করার প্রোগ্রাম হলো। এবার চাইনিজ রেস্তোঁরায় লাঞ্চ।

রাহাত ফোন করে দিবাকে কিছু কথা বলে। মেয়েটা বেশ চালাক। সামলে নিতে পারবে মনে হয় রাহাতের প্ল্যান। দেখা যাক।

ঠিক হলো, কামাল পরে এসে লাঞ্চে যোগ দেবে। তার সাথে থাকবে আরও দুজন ভদ্রলোক। কেউ জানে না, তারা কে হতে পারে? এটা রাহাতের রহস্য।

দুই বাড়ির মুরুব্বিদেরকে আড়াল করে যুবকেরা কি করছে, তা জানতে না পারলেও নানুবি কিছু একটা আঁচ করতে পারছেন। কিন্তু সেটা অনুমানই। কামালের ঘরে দুটো ফুলের মালা দেখেছেন তিনি। দুইভাই সারাদিন গুজ গুজ ফুস ফুস করে, কি বলে বোঝা যায় না। কি করতে চায় ওরা? পিচ্চি মেয়ে রুমকি, সেও যোগ দিয়েছে ওদের দলে। মেয়ে জামাই এখনও মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে। ঘটা বিয়ে, ঘটলো না। রাজ্যের জিনিসপত্র স্তূপ করে রাখা আছে কামালের ঘরে। নানুবির চোখে পানি এসে যায়। কি থেকে কি হয়ে গেলো! মেয়ে জামাই ঠিক করেছে, খাবার জিনিসগুলো সব এতিম খানায় পাঠিয়ে দেবে।

লাঞ্চের আয়োজনে পোলাও, কোর্মা, কোপ্তা, জর্দা, মিষ্টি দই, পান, সবই রাখা হয়েছে। রিজার্ভ টেবিল সাজানো হয়েছে ফুল আর নকল প্রজাপতি দিয়ে। চীনা ব্যাটারা প্রজাপতি কয়েকটা এতো চমৎকার করে বানিয়েছে, দেখে মনে হয় আসল। ফ্যানের বাতাসে ওদের ঝলমলে পাখাগুলো নড়ছে মাঝে মাঝে। বেশ একটা উৎসব উৎসব ভাব।

জরি চুমকির কাজ করা কমলা রঙের জর্জেট শাড়ি পরে এসেছে দোলন। কানে গলায় হাতে হালকা গয়না। খোঁপায় বেলি ফুলের মালা। কপালে চন্দনের টিপ। কী অপুর্ব যে লাগছে দোলনকে! মুগ্ধ হয়ে যায় রাহাত। দিবা মিতাও চমৎকার সেজে এসেছে। রাহাত বসেই ছিলো টেবিল আগলে।

- এসো এসো। রাহাত স্বাগত জানায় তিন কন্যেকে।

- আপনি একা? দিবা প্রশ্ন করে।

- তাইতো, একা কেন রাহাত ভাই? মিতা উৎকণ্ঠা দেখায়।

রাহাত হাসে। বলে, ধীরে বন্ধু ধীরে। দোলনদের বাড়ির খবর বলো।

- ওষুধ ধরেছে রাহাত ভাই। দিবার স্বপ্নের কথা শুনে মা বলেছেন, এই ভুলটা ভাঙাই কী করে এখন?

- মানে? রাহাত কৌতুহল চেপে রাখতে পারে না।

- মা বলতে চান, কী করে আবার বিয়ের কথাটা পাড়া যায়? দিবা মিষ্টি হেসে বলে, দোলনের বাবা চুপ করে শুনলেন।

- ব্যাস, ব্যাস। যুদ্ধের ময়দানে শান্তির হাওয়া পড়েছে। চুক্তি তো হতেই হবে। কিন্তু তোমাকে দেখেও তো কনে কনে লাগছে।

লজ্জায় লাল হয়ে যায় দিবা।

- ধরো তোমারও যদি বিয়ে হয়ে যায় আজ?

- কী যে বলেন না?

- যদি সম্ভব হয়ে যায়?

- না না, এমন করে বলবেন না, আমি এতিম মেয়ে। থাকি মামার বাসায়। আমার কোনও ভবিষ্যৎ নেই।

রাহাতের শেখানো কথায় দিবা গিয়ে দোলনের মাকে বলেছে, এক ফকির বাবা স্বপ্নে তাকে বলেছে, দোলনের বিয়েটা ভেঙে দিয়ে খুব ভুল করেছে তার বাবা মা। অন্য ঘরে বিয়ে হলে বড়ো ক্ষতি হয়ে যাবে। তাতেই কাজ হয়েছে। যারা সংস্কারে বিশ্বাস করে, তারা স্বপ্নের ফকিরের কথায় দিশেহারা হয়ে যাবে। এটাই স্বাভাবিক।

টেবিলে খাবার সার্ভ করতে শুরু করেছে। দোলন উস্ন খুস্ন করে। কামাল আসে না কেন? তবে কি এবার বরপক্ষ তাকে প্রত্যখ্যান করবে? আহা, কামাল যদি সেই ছেলেটাই তো? 'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা' গান করে আসর মাত করে দিয়েছিলো টিএসসিতে? ভারি ভয় করছে তার।

এমন সময় কামাল এলো দুজন অচেনা মানুষকে নিয়ে। রুমকি একাই এসেছে প্রায় সাথে সাথেই। পরিচয় করিয়ে দেয় রাহাত।

দোলনকে দেখেই সাত সরের ঢেউ হুমড়ি খেয়ে পড়ে কামালের বুকে। কি আশ্চর্য, এইতো তার পছন্দের কন্যা। বলে, আপনি এখানে? কেমন করে?

-আরে গা..., সরি, ও তো এখানেই থাকবে আজ, রাহাত হেসে বলে।

এমন সময় হুড়মুড় করে সুদর্শন এক তরুণ এসে বলে, আপনি কামাল সাহেব না?

- আপনাকে চিনতে পারলাম না ভাই, অপ্রস্তুত কামাল বলে।

- চেনার কথা নয়। আমি সেলিম। আপনার গানের ভক্ত। দেখেই কথা বলতে চলে এলাম।

রাহাত বললো, আসেন, আমাদের সাথে লাঞ্চে। আপত্তি আছে?

ছেলেটা গদ্গাদ হয়ে রাজি। মানুষ বাড়লো একজন।

কী থেকে কী হয়ে যায়! আসলে প্রজাপতি কোথাকার রঙ কোথায় লাগায়? দোলনের সকল শংকা উড়ে যায়। একেই তো সে চেয়েছিলো। এই তবে বর? সুনামির চেয়েও বড়ো ঝড় ওঠে তার বুকে। বেকার বাবা মায়েরা মেয়ের বিয়ে নিয়ে রাখ রাখ ঢাক ঢাক করে। কোথা থেকে ঘটক ডেকে আনলো। কিছুই জানতে দিলো না দোলনকে। অবশ্য দোষ তাদেরও আছে। কামালকে শুধু চিনতো সে। পরস্পরের বাবার নাম তো জানতো না কেউ। শুধু শুনলো ইসমাইল হোসেন ঢালির ছেলের সাথে বিয়ে হচ্ছে। ঢালি সাহেবের ছেলে যে কামাল, তা কি করে জানবে দোলন? ওপরওয়ালার দাবা খেলা বোঝে কার সাধ্য? কান্না এসে গেলো দোলনের।

বান্ধবীরা অবাক, দোলন কাঁদছে কেন?

মিতা বলে, বিয়েতে তোর মত নেই? এই, কথা বল্। কাঁদছিস কেন?

কান্নার উচ্ছ্বাসে দোলন কিছুই বলতে পারে না।

- প্লিজ কিছু বল্, এখনও সময় আছে দোলন। মিতার কান্না কান্না অবস্থা। এতো আয়োজন তাহলে বৃথা যাবে?

মিতাকে জড়িয়ে ধরে দোলন। ফিস ফিস করে কী যেনো বলে!

- ও, এই ব্যাপার তবে! মিতার হাসি ঝরে পড়লো ঝর্নাধারার মতো।

দিবার হাত ধরে এক রকম টেনে আনছে রাহাত। কিন্তু দিবা কাঁদছে কেন? চিন্তায় পড়ে গেলো মিতা। হচ্ছে টা কী? এতো কাঁদা কাঁদি কেন আবার!

চারটা ফুলের মালা নিয়ে এলো কে যেনো অন্য ঘর থেকে। আবার মালা কি জন্য? সেলিম দ্রুত গিয়ে মালাগুলো নিয়ে রাহাতকে দিলো।

লাঞ্চের আগেই বিয়ের নিবন্ধন হয়ে গেলো। তবে একটা বিয়ে নয়। তিনটে। রাহাতের সাথে দিবার, এবং সেলিমের সাথে মিতার নিবন্ধনও হয়ে গেলো।

বাবা মায়েরা বুঝতেই পারে না, জেনারেশন গ্যাপে তারা কতোটা পেছনে পড়ে আছে! প্রজাপতি এখন আর তাদের বশে নেই। প্রজন্ম ধরে আনে প্রজাপতিকে ঘর সাজানোর জন্য। গুছিয়ে নেয় জীবনকে নিজেদের মতো করে।

আরও একটা চমক ছিলো বাকি। সেলিম আসলে রেস্টুন্টের মালিক। ধনী মানুষ। খাওয়া শেষে চা কফি এ সব চলছে। এরই মধ্যে তাঁর এক কর্মচারি এসে জানালো, ভোর ছয়টার ফ্লাইটে ছয়টা টিকিট কনফার্ম করা হয়েছে অন-লাইনে। ঢাকা - ভুটান – ঢাকা সফর, তিন দিনের জন্য।

রাত দুটো তো বেজেই গেছে। এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছোতে হবে এয়ারপোর্টে।

চাওয়া পাওয়া

রাত দেড়টার সময় এসে ঢুকলো বাসায় সবাই। বিমান দেরি করার ফলে এই বিভ্রাট। এতক্ষণ বাসায় এসে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ার কথা। হঠাৎ বাহরাইন বিমান বন্দরে রব উঠলো, বিমানে বোমা আছে। আর যায় কোথায়? সমস্ত যাত্রী নামিয়ে দিয়ে শুরু হলো তল্লাশি। টানা তিন ঘণ্টা চললো তল্লাশির কাজ। ফলে মাসকাটে পৌঁছে দেখা গেলো, জেদ্দার বিমান চলে গেছে। তাই সাত ঘণ্টা অপেক্ষা করে পরের বিমানে আসতে হয়েছে জেদ্দায়। কোথায় বিকেল পাঁচটা, আর কোথায় রাত দেড়টা?

ক্লান্ত সবাই। বিমান বন্দরে অপেক্ষা করার মতো বিরক্তিকর ঘটনা আর কি হতে পারে? নাসিম কি বিরক্ত? দেরির জন্য তো কেউ দায়ি নয়! কপালে গেরো থাকলে সবখানেই ধরা খেতে হয়। জেদ্দায় নেমেও লাগেজ পেতে বেশ দেরি হলো। উচ্চ রক্তচাপের রোগী শাহেরা খাতুন। সময় মতো ওষুধ না খেলে মাথা ঝিম ঝিম করে। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে এখন রীতিমতো। হোক না ছেলের বাড়ি, এসেই শোয়ার কথা বলতে পারছেনা শাহেরা।

তেরো বছর পর ছেলে নাসিমের সাথে দেখা। কেমন যেনো হয়ে গেছে ছেলে। ছত্রিশ বছর বয়সেই মনে হয় ছাপ্পান্ন পেরিয়ে গেছে। রোগাটে শরীর একটু নাদুশ নুদুশ হয়েছে। ভালোই দেখাচ্ছে তাতে। কিন্তু মাথার চুল পড়ে গেছে অনেক। আর গম্ভীর হয়েছে বেশ। সারাটা রাস্তা বলতে গেলে কথাই বলেনি। মনে হয় মা আর ছেলে নয়, যেনো দূরের কোনো আত্মীয়কে বিমান বন্দরে নিতে এসেছে। এখনও কি মনে পুষে রেখেছে সেই অভিযোগগুলো? কেমন করে ওঠে শাহেরার বুকের ভেতর।

বৌ আর দুই বাচ্চা বাসাতেই ছিলো। দরজা খুলে দিলো বৌ রাবেয়া। দুবাই প্রবাসি বাংলাদেশি মেয়ে। ইংলিশ মিডিয়ামে লেখাপড়া করেছে। চাকরিও করে বাচ্চাদের একটা স্কুলে। পেছন পেছন এসে গা ঘেঁশে দাঁড়ালো জমজ

দুই ছেলে রনি আর জনি। বয়স ছয়। দাদির সাথে আগে দেখা হয়নি তাদের। রাবেয়ারও না। পা ছুঁয়ে সালাম করলো রাবেয়া। ছেলেদের বললো, দাদিকে সালাম করো।

নাসিম বেশ জোরে ক্যারিঅনটা মেঝেতে রাখলো। আঁতকে ওঠে শাহেরা। বলে, এতো জোরে কেন বাবা? খেলনা আছে, ভেঙে যেতে পারে। তটস্থ হয়ে উঠলো বৌটা।

কথা না বলে বড়ো সুটকেসটা গড়িয়ে নিয়ে চলে যায় নাসিম ভেতরে।

অবাক হয় শাহেরা। এখানে আসার আগে তো ফোনে অনেক কথা হয়েছিলো ছেলের সাথে। অনেক দিন থেকেই ছেলের বাড়ি আসার কথা। নাতিদের দেখার ইচ্ছে। সেই যে নাসিম দেশে ছেড়ে গেলো, তারপর যোগাযোগ ছিলো না সাত বছর। কী যে দুঃসহ সময় কেটেছে তখন শাহেরা আর তার স্বামী সাদেক আলির! মায়ের ওপর না হয় রাগ ছিলো, বাবা তো তাকে প্রাণের অধিক ভালোবাসতো!

নাসিমের রাগ ছিলো বাবার ওপর। মা তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিলে বাবা কেন মেনে নিলেন সেটা? তাই সে ক্ষমা করেনি বাবাকেও। সাত বছর পর খবর পেয়ে বাবা কতোবার আসতে চেয়েছে জেদ্দায়। রাজি হয়নি নাসিম। বলেছে, কে নাসিম? সে তো মরে গেছে।

-এমন করে বলে না বাবা। কেঁদে কেটে বলেছে সাদেক আলি।

-মা যখন বেত দিয়ে মারতো, তখনও তুমি প্রতিবাদ করোনি।

-লেখাপড়ার সময় আমরাও কতো বেতের বাড়ি খেয়েছি। ওসব কথা কি মনে রাখতে হয় বাবা?

-তুমিও মেরেছো অঙ্ক করাতে গিয়ে। শরীর কেটে রক্ত ঝরেছে, ভোলা যায় না সেই সব কথা।

-বুঝতে পারি, খুব ভুল হয়েছে। সেটা তো আর ফিরবে না বাবা।

-আমি চাই না ফেরাতে। আমার এখন কোনো কিছুর অভাব নেই।

-আমাদেরও নেই। তুই যা চাবি তাই দেবো। শুধু বাড়ি চলে আয়।

-অভাব তখনও ছিলো না তোমাদের। একটা খেলনা ভেঙে গেলে মায়ের সে কি মার!

-মা তোমার খেলনাগুলো রেখে দিয়েছে যত্ন করে, তোমার বাচ্চাদের দেবে বলে।

-এখন আমার ঘরেই কতো খেলনা এখানে ওখানে পড়ে থাকে। অথচ...

-তুমি যে একেবারে খেলোনি, সেটাও তো ঠিক কথা না বাবা।

-কথা ঠিক। কিন্তু ছোটো ভাইয়ের একটা খেলনা ভাঙার জন্য কাপড় খুলে ন্যাংটো করে ঘরের বাইরে বের করে দেয়ার কথা কথা শুনেছো কোনোদিন?

শেষ হয়ে যায় কথা সাদিকের। কিছু বলার থাকে না আর।

দিন যায়। আবার কথা বলে সাদিক। আর কথা তো একটাই, কি করলে নাসিমের রাগ পড়বে? সে বাড়ি আসতে চাইবে, সেজন্য সাজিয়ে গুছিয়ে প্রসঙ্গ টানা।

শাহেরাও কথা বলে ছেলের সাথে। কিন্তু সুর লাগে না সারেঙিতে। মাঝে মাঝে ঝগড়াও হয়ে যায়। নাসিম কী চায়, তা বোঝা যায় না। তার ওপর এমন করে কথা বলে, যেনো শত্রুর সাথে বোঝাপড়া হচ্ছে। কখনও রাগ ঝাল করে ফোন কেটে দেয়। হয়তো কথা বন্ধ থাকে কয়েক সপ্তা।

আবার ফোন করে, হয় শাহেরা নয় সাদিক। যে কোনো মূল্যে তারা ছেলের অভিমান ভাঙাতে চায়। দূর করতে চায় ছেলের কষ্ট। বাবা মাও যে পেছনের কথা ভেবে এখন কষ্ট পাচ্ছে, সেটা নাসিম বুঝতেই চায় না। বলে, সব তোমাদের ঢং। লোক দেখানো ঢং।

একদিন বললো, আমি চলে আসাতে তোমাদের অনেক টাকা বেঁচে গেছে। সেটা ভেবেছো কখনও?

-সব টাকাই আমি রেখে দিয়েছি তোমার জন্য বাবা, শাহেরা বলেছে।

-কতো টাকা রেখেছো? আমাকে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত পড়াতে কতো টাকা লাগতো তোমাদের? সেই সব টাকা যদি আমি চাই?

-দেবো, সব দেবো, শাহেরা বলে।

আবার হয়তো একদিন বলে, বাসা থেকে আসার সময় আমি ছিলাম রাস্তার ফকির। তোমাদের কোনো কষ্ট হয়নি তাতে। আজ আমার অভাব নেই, কিন্তু দুঃখটা আছে। এখন টাকা দিয়ে কি করবো?

যা হওয়ার হয়ে গেছে বাবা, তুই বাড়ি আয় একবার। আমাদের এই বাড়িঘর সবই তো তোদের।

-দিয়ে দাও সব তোমাদের ছোটো ছেলেকে। এখন আর কিছুরই প্রয়োজন নেই আমার। মনে করো নাসিম বলে কেউ ছিলো না তোমাদের।

রাগে ফোঁস ফোঁস করতে থাকে নাসিম।

তবু রফা একটা হয়েছিলো। নাসিম এসেছিলো বাড়িতে দুই সপ্তার জন্য। মা বাবা দিয়েছিলো দশ লাখ টাকা। খালা চাচার সহযোগিতায় আপোস হয়েছিলো। কথা দিয়েছিলো নাসিম, পরিবারের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করবে। কিন্তু হয়নি সেটা। তবু ছেলে তো! এক তরফাই থাকে সম্পর্ক।

দুতিন বছর চলে এইভাবে। হঠাৎ হার্ট এটাকে সাদিক চলে গেলো। তখন এসেছিলো নাসিম। অনেকেই মনে করেছিলো, এবার হয়তো মন গলবে নাসিমের।

কিন্তু না, গলেনি মন। দশ দিনের মাথায় বাবার চল্লিশার দোয়া আর এতিমখানায় একবেলা খাওয়ানোর কাজ সেরে চলে গেলো সে। আবার বিরতি যোগাযোগে।

প্রায় ছয়মাস পরে ফোন করে শাহেরা। ছোটো ছেলে জসিম এসএসসি পাশ করেছে সেই খবর দিয়ে।

আসলে খবর দেয়াটা অছিলা। শাহেরা চাইছিলো নাসিমের সাথে সম্পর্ক জাগিয়ে তুলতে।

জসিম কথা বললো বড়ো ভাইয়ের সাথে। সেও চায় ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক রাখতে। বাবা নেই। ফাঁকা বাড়ি। ভাই এসে তাদের সাথে থাকলে নিশ্চয় ভালো লাগবে সবার। তাছাড়া নাসিম তো বলেছিলো, মাঝে মাঝে সে বাড়ি আসবে। সেই কথা মনে করিয়ে দেয় জসিম।

নাসিমও চায় দেশে যেতে। কিন্তু পরক্ষণেই শক্ত করে নেয় মনকে। হয়তো মায়ের সাথে তার সম্পর্ক আর কোনদিনই স্বাভাবিক হবে না। পচে যাওয়া সম্পর্ককে টেনে চলার দরকারই বা কি?

শাহেরা চায়, নাসিম দেশে আসুক। হলো তো বিদেশে থাকা। এবার দেশে এসে বিয়ে থা করে সংসার করুক। বুঝে নিক নিজেদের বাড়ি সহায় সম্পদ যা আছে।

নাসিমের মন কখনও দুলে ওঠে। কিন্তু মাকে সে ক্ষমা করতে পারছে না মন থেকে। শৈশবের ক্ষতগুলো থেকে ক্ষরণ হয় আজও। সবচেয়ে অবাক লাগে তার মায়ের নির্লিপ্ততা দেখে। যেনো কিছুই করেনি সে ছেলের সাথে। কেন তাকে কাছে নিয়ে বলতে পারে না, বাবা আমি আজ বুঝতে পারি সব। কিন্তু দিন তো আর ঘুরে আসবে না। সামনের দিনগুলোকে আমরা সাজিয়ে তুলতে চেষ্টা করবো। কেন পারে না মা সহজ হতে? কেন পারে না মা তাকে আদর করতে?

শাহেরা চায়, নাসিম এবার সহজ হোক। তার অভিযোগের পর অনেক টাকা দেয়া হয়েছে তাকে। সে ক্ষতিপূরণ চেয়েছিলো। বাবা সেটা দিয়েছে। বাবাটা দুনিয়া ছেড়ে চলেও গেছে। বড়ো ছেলে হিসেবে তার কিছু দায়িত্ব আছে, সেটা এবার পালন করা উচিত তার।

নাসিমের কথা, তার কোনো দায়িত্ব নেই মা ভাইকে দেখা শোনার জন্য। তাকে যখন দেখা শোনার কথা ছিলো, তখন তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে মা। এর ক্ষতিপূরণ হয় না।

তবুও যোগাযোগ থাকে জসিমের জন্যই বলতে গেলে। বাড়ির প্রতি মায়া জাগে না নাসিমের। দিন বসে থাকে না। বয়সও বসে থাকে না। নাসিম বিয়ে করলো একা একা। বছর খানেক পরে জানালো সে কথা। অভিমান হলো মায়ের।

নাসিমের জমজ বাচ্চা হলো। জানালো না কাউকে। দুবছর পরে ছবি পাঠালো বাচ্চাদের। ছেলে বৌ আর নাতিদের ছবি দেখে শাহেরার বুকের ভেতর মুচড়ে ওঠে। তার ছেলে আজ ছেলের বাবা হয়েছে। এখন তো বোঝা উচিত মা বাবার মন। তার চাওয়াগুলো এখনও একেবারেই বোঝে না নাসিম।

শাহেরা চায়, বৌ বাচ্চা নিয়ে ছেলে দেশে আসুক। বিয়ের অনুষ্ঠান তো আর হবে না। নাতিদের আগমনকে কেন্দ্র করে একটা জমকালো রিসেপশনের অনুষ্ঠান করা যাবে। আর কিই বা করতে পারে শাহেরা? তবে কি ছেলের হাতে পায়ে ধরে মাফ চাইতে হবে তাকে? ও কি তাই চায়?

দিন যায়। ব্যাটে বলে মেলে না। বাড়িতে আসতে পারে না নাসিম নানা কারণে। এদিকে শাহেরার বয়স বাড়ছে। হজ করার ইচ্ছে তার। সেই তো জেদ্দা যেতে হবে। সেখানে গিয়ে ছেলের বাড়ি উপস্থিত হলে ছেলে কি আর থাকতে বলবে না?

ফোনে কথা হয়েছিলো নাসিমের সাথে। কথা হয়েছিলো বউয়ের সাথেও। মনে আশা হয়েছিলো, এইবার হয়তো মিটে যাবে সব কিছু। নাসিমও ভেবেছিলো, আর রাগ ক্ষোভ নয়। বাচ্চারা বড়ো হচ্ছে। দাদির সাথে সম্পর্ক হোক। ভেবেছিলো, মায়ের সাথে স্বাভাবিক আচরণ করতে পারবে। এখন তার সংসার হয়েছে। বাচ্চারা বড়ো হচ্ছে। নিজস্ব জীবনের বৃত্ত তৈরি হচ্ছে। ভুলে যেতে হবে তাকে পেছনের সব কথা।

সেই যে সুটকেস নিয়ে ঘরে গেছে নাসিম আর বাইরে আসেনি। শাহেরাকে একটা শোয়ার ঘরে বিশ্রাম নিতে বলে বউটা গেছে সামান্য কিছু নাশতা আনতে। কিছু খাবে না বলেছিলো শাহেরা। শুনতে চাইলো না বউ। ফুটফুটে বাচ্চা দুটো আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। একটু আদর করাও হলো না।

সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হলো শাহেরার। বাড়িটা একেবারে শুনশান। বৌ বলেছিলো, সবাই বাইরে যাবে সকালে। এটাই এই বাড়ির চলন। বাচ্চা দুটো স্কুলে, বউ কাজে আর ছেলেও কাজে চলে যায়। সপ্তার দিনগুলোতে এর ব্যতিক্রম নেই। ছকে বাঁধা যান্ত্রিক জীবন। বিকেলে ফিরবে বউ আর বাচ্চারা। সন্ধের পরে ছেলে। ছেলেরা লেখাপড়ার কাজ শেষ করে টিভি দেখবে, খেলবে, মায়ের সাথে গল্প করবে। রাতে একসাথে সবাই খাবে।

ঘুরে ঘুরে এঘর ওঘর দেখলো শাহেরা। বেশ গোছান গাছানো সব। রান্না ঘর ছিমছাম, পরিপাটি, পরিস্কার। ইলেকট্রিক চুলার পাশে বিছানো পাটাতন। সেখানে কফি মেশিন, ওয়াটার কুকার, টোস্টার। ফ্রিজ খুলে দেখে পাউরুটি মাখন চিজ জ্যাম, সব রাখা আছে। একপাশে সারি সারি ডিম। বাটিতে ঢাকা মাংসের তরকারি, আর প্লাস্টিকের কন্টেইনারে কী যেনো আছে। খুলে দেখতে ইচ্ছে হয় শাহেরার।

কৌতুহল থেকেই কন্টেইনার খোলে। সুন্দর খোশবুতে ভরে যায় কাছের বাতাস। রান্না করা খাশির বিরিয়ানি। মনে হয় খেয়ে বেঁচেছে, সেটাই রাখা। চকিতে মনে পড়ে যায় একদিনের ঘটনা। সন্ধে বেলা দেরি করে বাড়ি ফিরেছিলো বলে সেদিন অতিথির সাথে নাসিমকে খেতে বসতে দেয়নি। খেতে দেয়নি বিরিয়ানিও। সে কথাটা অনেকবার বলেছেও নাসিম। ফোনেই বলেছে। বলেছে, আজ আমার বাসায় প্রতি সপ্তায় বিরিয়ানি রান্না হয়। কিন্তু সেদিনের দুঃখ ভুলতে পারি না।

শাহেরা শুটকি মাছ এনেছে সাথে করে। নাসিম পছন্দ করে। ভেবেছিলো রান্না করবে। প্রথম কথা, রান্না করার হাঁড়ি ডেকচি মশলা পাতি, কোথায় আছে, তা জানে না। দ্বিতীয়, অনেক খাবার আছে ফ্রিজে। সেগুলোই হয়তো আজ খাওয়া হবে।

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ শুনে চমকে ওঠে শাহেরা। তাড়াতাড়ি ওদিকে যায়। দেখে, নাসিম হন্ত দন্ত হয়ে শোয়ার ঘরে ঢুকছে। হাতে মিষ্টি প্যাকেট। সামনা সামনি দেখা হয়ে গেলো।

-উঠে পড়েছো? আর একটু ঘুমালে পারতে, নাসিম বলে।

-ভেঙে গেলো ঘুম।

-নাশতা খেয়েছো?

-না।

-এখানে তোমাকে কেউ খেতে মানা করবে না। ফ্রিজে খাবার আছে। যেটা ইচ্ছে খেতে পারো।

-তোমরা সকালে খেয়ে বের হও না?

-আমি কফি ছাড়া কিছু খাই না সকালে।

-খালি পেটে কফি? উদবেগ ঝরে পড়ে শাহেরার কণ্ঠে।

-আমার কফির তৃষ্ণার কথা মনে নেই তোমার?

চুপসে যায় শাহেরা। ছোটো বেলা থেকেই কফি পছন্দ ছিলো ছেলেটার। কিন্তু দেয়নি শাহেরা। দুপুরে সে ঘুমালে কখনও চুপি চুপি কফি করে খেয়েছে নাসিম। ধরাও পড়ে যেতো মাঝে মাঝে। শাস্তিও দিতো শাহেরা। কান ধরে বার বার বলাতো, আর এমন কাজ করবে না।

খাবার টেবিলে রাখা গ্লাসে পানি ঢেলে চটপট দুটো ট্যাবলেট খায়। বলে, চলো রান্নাঘরে তোমাকে কফি বানিয়ে দিই। আমিও আর এককাপ খাই।

-কফি খাওনি সকালে?

-খেয়েছি। আবার খাবো। ভালো লাগে। হাসে নাসিম মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে। ভেতর থেকে গুটিয়ে যায় আবার শাহেরা। মনে হয়, ইচ্ছে করেই মাকে দেখিয়ে দেখিয়ে কফি খেতে চায় নাসিম।

-চলো রান্নাঘরে। তোমাকে নিজের হাতে কফি বানিয়ে খাওয়াই। নাসিমের কথায় মন্ত্রমুগ্ধের মতো রান্নাঘরে আসে শাহেরা।

-ফ্রিজে বিরিয়ানি আছে, ইচ্ছে হলে খেতে পারো। নাসিম ওয়াটার কুকার অন করে।

-সকালে কে বিরিয়ানি খায় বাবা?

-আমি খাই মাঝে মাঝে। তুমি তো জানো, কী ভালোবাসি আমি বিরিয়ানি খেতে। এখন আমি স্বাধীন মা। তোমার বউ রাবেয়া, আমার শৈশবের কথা সব জানে।

-কী জানে? মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় শব্দ দুটো।

-ভুলে গেছো মা? নাসিম হাসে আবার।

কথা বলতে পারে না শাহেরা। ছেলেটা এমন করে কথা বলছে কেন?

-মিষ্টি এনেছি, খেও। আমি আর খেতে পারি না। ডায়াবেটিস হয়েছে।

-আমিও তো ডায়াবেটিসের রোগী। প্রায় ফিস ফিস করে বলে শাহেরা।

-বাচ্চারা খুব পছন্দ করে খেতে। কে জানে কখন আবার ওদেরও রোগ হয়। ছোটোবেলা খেতে চাইতাম। তখন ডায়াবেটিস ছিলো না। এখন খেতে পারি, কিন্তু রোগই বাধা।

কফি বানিয়ে নিজে এক কাপ নেয় নাসিম। মায়ের দিকে বাড়িয়ে দেয় এক কাপ।

-ও, তুমি তো নাশতা খাওনি।

-থাক পরেই খাবো। কফিটা খাই এখন।

গরম কফি দ্রুত শেষ করে চলে যায় নাসিম।

দুদিন কেটে গেলো কোথা দিয়ে। এলো শুক্রবার। বন্ধের দিন। বাপরে সে কী ঘুম সবার। দশটা বেজে যায় তাও জাগে না কেউ। অস্বস্তি লাগে শাহেরার। ইচ্ছে ছিলো আজ একবার কাবা ঘরের কাছে যাবে। কথাটা

পাড়াই হয়নি। নিজের ছেলের সাথে মন খুলে কথা বলা হচ্ছে না। কোথায় যেনো দেয়াল থেকে যাচ্ছে। আজ বলতেই হবে কাবাঘরে যাওয়ার কথা।

ব্রাঞ্চ খেতে বসেছে সবাই। পরাটা, আলুভাজি, ডিম ভাজি, টিকিয়া কাবাব, নিরামিশ তরকারি, পায়েস, মিষ্টি দই, চা, কফি, দুধ রাখা আছে। বাচ্চারা দুধ খাবে। বড়োরা চা কফি যার যেটা ইচ্ছে খাবে।

শাহেরা অবাক হয়, বিরক্তও হয়। এতো খাবার কেন সকালে? অতিথি এলে শাহেরাও এই রকম আযোজন করতো। তবে সেটা শুধু অতিথিদের জন্য। নাসিম জসিম দুই ভাই এতো খাবার পেতো না। লোভ পুষে রেখে উঠে পড়তে হতো টেবিল থেকে।

নাসিম খাচ্ছে সবই। বাচ্চারাও খাচ্ছে যার যা খুশি। হঠাৎ মিষ্টি দইয়ের বাটি উলটে গেলো রনির হাত থেকে। দেখেও দেখলো না নাসিম।

তটস্থ হয়ে উঠলো শাহেরা। বকা দিতেও পারছে না। বেশি আল্লাদিপনা ভালো লাগে না তার। বললো, আমি জানতাম দইয়ের বাটি পড়ে যাবে হাত থেকে। মেখে গেলো তো সব।

হেসে ওঠে নাসিম। বলে, তোর কপাল ভালো রনি, রাবেয়া পিটুনি দিচ্ছে না।

-সে কি? মারবো কেন? ও তো ইচ্ছে করে ফেলেনি, রাবেয়া বলে।

-আমরাও ইচ্ছে করে ফেলতাম না। কিন্তু খাবার টেবিলে কিছু পড়ে গেলে রক্ষে থাকতো না।

বিশ্রি একটা অপমান বোধে বিব্রত হয় শাহেরা। একটু সামলে নিয়ে বলে, তোদের শুধু মেরেছি না? ভালোবাসিনি?

-বেসেছো নিশ্চয়ই। কিন্তু সেই ভালোবাসা দিয়ে কষ্টগুলো ধুয়ে ফেলতে পারোনি মা।

-আমাদের কালে সবাই এমনি করেই শাসন করতো। আমরাও কম মার খাইনি।

-এখনও বলছো, তুমি ঠিক কাজ করেছো মা? একটুও লজ্জা পাচ্ছো না?

থর থর করে কেঁপে ওঠে শাহেরা। এ কি কথা বলার ছিরি ছেলের? আদব কায়দা কিছুই কি শেখায়নি সে ছেলেকে?

এক কথা দু কথায় লেগে গেলো মা ছেলের মধ্যে। যেমন লেগে যেতো ফোনে কথা বলার সময়। একবার না, অনেকবার হয়েছে এমন। শাহেরা ভেবেছিলো সাক্ষাতে ভদ্র আচরণ করবে ছেলে। কি ভেবেছে সে? বাড়িতে পেয়ে অপমান করবে? সে জন্যই আসতে বলেছিলো?

নাসিম ভেবেছিলো, কিছুতেই সে মায়ের ওপর রাগ করবে না। হাজার হলেও সে মা। সমাদরে রাখবে তাকে। কিন্তু মানুষ যা চায় তা কি করতে পারে? কেন সে ভুলতে পারে না তার অতীতের কষ্ট?

বৌয়ের মধ্যস্থতায় শান্তি এলো। কিন্তু খাওয়া হলো না ভালো করে কারও। শাহেরা কেঁদে কেটে একাকার করলো। নাসিম চলে গেল বাইরে।

প্রতিদিন কোনো না কোনো কথার সূত্র ধরে মায়ের সাথে নাসিমের দুকথা হয়ে যায়। দুজনেই চায় সহজ হতে। নাসিম চায়, মা তাকে আদর করবে ভালোবাসবে অনেক। মা চায়। ছেলে তার সাথে সহজভাবে কথা বলবে, কাছে আসবে। খুব সাধারণ চাওয়া।

শাহেরা ভাবে, ছেলের ঘর হয়েছে, সংসার হয়েছে, বাচ্চা হয়েছে। পেছনের কথা ভুলে সে এখন তার বর্তমান জীবনে ডুবে থাকবে।

নাসিম ভাবে, মা কেন তার ছোটোবেলার পাওনা আদরগুলো দিতে পারে না? কেন আফসোস করে না? কেন ভুল স্বীকার করে না? অভিমান গাঢ়তরো হয় তার।

দুজনেই দুজনকে আপন করে পেতে চায়। কিন্তু কোথায় যেনো কী হয়ে যায়। কাছাকাছি আসতে গেলেই বদ গন্ধে ভরে যায় বাতাস। বেশি কাছে চাইলে আগুন জ্বলে ওঠে বাতাসে। নমনীয় হতে পারে না কেউ। চাওয়াটা আরও তীব্র ব্যর্থতায় ভেঙে যায় খান খান হয়ে। পাওয়ার ঘরে জমা হয় জমাট থকথকে রক্তাক্ত হতাশা আর নিরাময়হীন বিপন্ন কান্না।

পরাজিত বিধ্বস্ত অপমানিত শাহেরা বুঝতে পারে না, কি করবে সে? নাসিমই কি জানে?

ব্যথা

রাত থেকেই নানু কাঁদছে। খুব সহনশীল মানুষ বলেই সবাই জানে তাকে। সেই মানুষটা কাঁদছে। ছেলের বৌএর সময় নেই কাছে গিয়ে দেখার। পৌত্র পৌত্রিরা জন্মশহরের বাইরে। কেউ চট্টগ্রাম, কেউ সিলেট, কেউ ঢাকা। তিন মেয়ে, আয়না, গয়না, ময়না দিনাজপুর, পাহাড়পুর আর রাজশাহীতে ওদের শ্বশুর বাড়িতে। তবু তো গয়নার মেয়ে সুমনা মাঝে মাঝে আসে রাজশাহী থেকে। বড়ো মায়া করে মেয়েটা নানুকে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞানে অনার্স পড়ে সুমনা। তা মাসে একবার তো আসবেই নানুকে দেখতে। ক্যালেন্ডার দেখে হিসেব করে না নানু, পূর্ণিমা দেখে তার হিসেব। বুঝতে পারে নাতনিটা কতোদিন আসেনি বা কখন আসবে। চাঁদ দেখে মনে হচ্ছে, আজ কালই আসবে সুমনা। নানুর কান্না তাই আবেগে দ্বিগুন হয়ে থাকছে। থেকে থেকেই কান্না আসছে তার। এবার সত্যি বলবে নানু, কেন এতো কাঁদছে সে দুদিন যাবৎ।

বয়সি ছেলে কেরামত জোতদার, ব্যস্ত তার ধানের হিসেব নিয়ে। সে ঠিক করেছে, এবার আর ধান বিক্রি করবে না। মিল থেকে চাল করবে। তারপর বিক্রি। ধান বিক্রিতে শুধু লোকসান। কেন যে এতোদিন এই সাধারণ বিষয়টা তার মাথায় আসেনি! জমি জিরেত কমতে কমতে তলায় ঠেকেছে। ছেলে-মেয়েদের মানুষ করতেই গেছে সব, তাতে দুঃখ নেই কেরামতের। জমি বিক্রির ব্যাপারে বৌ নসিরন কান্নাকাটি করলে সে বলতো, এই টাকা তো আমরা ফুর্তি করে উড়াই না বৌ। ছেলে মেয়ে মানুষ করি। আমি চাঁদের হাট বসিয়ে যাচ্ছি তোমার জন্যে। তুমি ভেবো না। এতো বিশ্বাস নিয়ে বলতো কথাগুলো, নসিরন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতো স্বামীর মুখের দিকে। কথা সত্যি। ছেলে-মেয়েরা মানুষ হয়েছে। পাশ দিয়ে চাকরি করছে সবাই। বড়ো ছেলে বলেছে, বাবা মায়ের টিনের ঘরটা পাকা করবে এই

বছরেই। উপচে ওঠে একটা খুশির নিঃশ্বাস। তবু ফালা ফালা কলিজা থেকে ক্ষরণ হয়। স্বামীর মুখের বিষ তার সহ্য হয়নি কখনই।

নসিরন খুব গিন্নি। হাতে পায়ে লক্ষ্মী নিয়ে চলে সে। শাশুড়ির প্রিয় একমাত্র বউ। লালপুর থানা হাইস্কুলের হেড মাস্টারের মেয়ে সে। ক্লাস নাইনে পড়ার সময় বিয়ে হয়ে যায়। শিক্ষা জিনিসটা কী, বাবার কাছে শুনে শুনে তার একটা ধারণা হয়েছিল। সে তো মেয়ে। লেখাপড়া না করেও চলে যাচ্ছে। কিন্তু তার ছেলে-মেয়েদেরকে সে লেখাপড়া শেখাবেই। শহরমুখী করবে। তাই জমি বেচে ছেলে-মেয়েকে লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা নিতে তার আপত্তি নেই। নইলে নগদ টাকাই বা পাবে কোথায় তারা? তবু জমির জন্য তার কষ্ট হয়। মনে হয়, কে যেনো বুকে খামচা দিয়ে খানিকটা মাংস তুলে নিয়ে গেলো। তখন কাঁদতে বসে। তবে বৌটার কান্নার হাউস আছে। কাঁদতেও পারে।

নানু তো আর তেমন নয়। তার নিজের মানুষটা তাকে মেরে বকে কাঁদিয়ে কষ্ট দিয়ে শক্ত পোক্ত করে গেছে। তবে মাঝে মাঝে কান্নার ঘটনা সবার জীবনেই থাকে। নাটোরের সাধনগর গ্রামের এক বর্ধিষ্ণু পরিবারের নানু, ফাতিমা বিবি কেন কাঁদে, কেউ জানতে চায়নি গতো দুদিনের মধ্যে। এটাও স্বাভাবিক তার জীবনে। স্বামী চলে যাওয়ার পর তেত্রিশ বছর ধরেই তার একা একা কাঁদার ইতিহাস। কিন্তু পঁচাত্তর বছরের ফাতিমা বিবির আজকের কান্না অন্যরকম। গলে গলে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে তার। ফুঁপিয়ে বুক ভাসিয়ে মাটিতে লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদতে পারলে আরও ভালো হতো সেই সেদিনের মতো। বুকটা জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে তার সেই সেদিনের মতোই। এতো কষ্ট কয়েকটা শব্দে?

এমন একটা স্বপ্ন দেখার কোনো প্রয়োজন ছিলো কি? তাদের সংসারে বিধবা নিঃসন্তান এক জা ছিলো। একমাত্র সেই শাসন করতো দজ্জাল স্বামীটাকে। শ্বশুরবাড়ির অতি প্রিয় বউ রোশেনারা। তার কাছে সংসারের সব নালিশ জানাতো স্বামী আলী শাহ করিম। এটা নিয়ে কতো যে অশান্তি হয়েছে তার জীবনে! ভাশুরকে সে দেখেনি। তার বিয়ের এক বছর আগে সাপের কামড়ে মারা যায়। বউটাকে কেউ যেতে দেয়নি। যেমন তার ভালো গুণ, তেমন তার মন্দ গুণ। খুব চতুরও। সবাইকে বশে রাখতে পারতো কথায় এবং কাজে।

স্বপ্নে দেখা দিয়েছে সে আজ। প্রায় চল্লিশ বছর আগের সেই কথাটা আজ আবার তাকে বললো ভাবি। কি দরকার ছিলো তার জর্জরিত বেদনার বাগানে আবার একবার নতুন কাঁটা গাছ রোপণের? সমস্ত কষ্টের স্মৃতি দুহাত দিয়ে মুছে ফেলতেই চায় সে প্রতিদিন। না হলে নামাজ পড়া, দোয়া দরুদ পড়ায় ভুল হয়ে যায় বারে বারে। বহু বছরের ক্ষত সেরে গিয়েও ভেতরে টনটন করে ওঠে মাঝে মাঝে। আলীর দেয়া শারীরিক আঘাতের চেয়ে মুখের কথার আঘাত ছিলো আরও বহুগুণ ধারালো। কটুভাষী মানুষটার দিল ছিলো ঝামার মতো। যেমন শক্ত, তেমন কর্কশ। কথা দিয়ে মানুষের গায়ের চামড়া তুলে নিতে পারতো সে। ভালোর মধ্যে ছেলে-মেয়েদের মানুষ করার প্রবল চেষ্টা।

সহ্য তো করতেই হয়েছে। চারটে সন্তান ফেলে যেতে পারেনি সে। আবার সাথে নিয়ে যাওয়ারও কোনো জায়গা ছিলো না। মা মারা গেলে বাবা বিয়ে করলো। না করেই বা করবে কি? পাঁচটা সন্তানের দেখাশোনা করা সম্ভব ছিলো না। রান্না খাওয়া বাসার কাজকর্মও তো কম কিছু না। ফাতিমার কোলে তখন দ্বিতীয় মেয়ে গয়না। মোদ্দা কথা হলো, সেখানে গিয়ে দুইবেলা আরাম করে ভাত খাওয়ার কপালও ছিলো না তার। উঠতে বসতে সে কথা বলতো আলী। যেনো কতো মজার বিষয়, এমনি ভাবে হেসে হেসে বলতো। মাঝে মাঝে ফাতিমার মনে হতো, মাথায় ছিট আছে আলীর।

একদিন প্রতিবাদ করেছিলো ফাতিমা। বলেছিলো, এই কথাটা বার বার বলে তোমার লাভ কী হয়?

আর যায় কোথায়? বোমা ফাটলো। চিৎকার করে বললো, আমার ইচ্ছা আমি বলবো। কথাটা তো মিছা না। না?

-নিজের মা থাকলে তো আর এমন হতো না।

-সেটা কপাল তোমার। কুলক্ষনা মেয়েমানুষ কোথাকার!

-গালাগালি করো না অসভ্যের মতো।

-কি করবি তুই? যাবারও তো জায়গা নাই।

-যাবো কেন? ভাবিরও তো যাবার জায়গা নেই, তাকে তো বলা হয় না এসব কথা?

-খবরদার! ভাবির সাথে তুলনা করলে বটি দিয়ে মুখ চেঁছে ফেলবো। বুঝলি?

বস্তির মানুষের মতো ভাষা শুনে মুখ ফিরিয়ে নেয় ফাতিমা। আপন মনে কাঁদতে কাঁদতে বলে, এতোদিন হয়ে গেলো, স্বামীর বাড়িতে শেকড় শক্ত হলো না এখনও।

-মানে কী রে, মানে কী? তেড়ে ওঠে আলী।

-বোঝো না?

-পরের বাড়িতে তাইলে থাকিস কেন? যা, চলে যা। তালাক দিয়ে দিই।

-আবার সেই কথা? ছি! স্বর ভাসিয়ে কাঁদতে বসে যেতো ফাতিমা বিবি। অপমান আর হতোমান বিষাক্ত তীরের মতো গায়ে গেঁথে থাকতো দুচার দিন। খেতে, বসতে, উঠতে, শুতে বিষের খোঁচায় জর্জরিত শরীরে জ্বর এসে যেতো মাঝে মাঝে। ছেলে-মেয়েরা চোরের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে থাকতো। পারতপক্ষে বাবার সামনে পড়তে চাইতো না। মাকেও সান্ত্বনা দিতো না তারা।

নির্বিকার আলী। যেনো কিছুই হয়নি। ভাবির কাছে গিয়ে পেঁয়াজ মরিচ সর্ষের তেল দিয়ে মেখে মুড়ি বা চাল ভাজা খেতো। সাথে এককাপ চা। কোনোদিন ভাবি সন্ধেবেলায় এককাপ চা নিয়ে আসতো ফাতিমার কাছে। হয়তো তার মন ভালো হয়নি তখনও। বলতো, চা খাবো না ভাবি।

-শোন্, পুরুষ মানুষকে কখনও কখনও পাগল মনে করবি। নাহলে বাঁচবি কেমন করে?

-তুমিও তাই মনে করতে ভাবি? চোখ মুছে প্রশ্ন করে ফাতিমা।

-নে ধর, চা নে।

-কথার উত্তর দিলা না ভাবি?

- আমার মানুষটা ভালো ছিলো রে। সেই জন্য তো চলে গেলো। বাবা মায়ে চাইলো আমার আবার বিয়ে দিবে। পারিনি রে। মনটা উপড়ে দিয়ে দিয়েছিলাম ওকেই।

ফাতিমার কান্না থামে না। বলে, এতো কেন মুখ খারাপ ওর ভাবি?

-কি করবি বল্? কপাল, সব কপাল। তোর ছেলে-মেয়েরা মানুষ হচ্ছে। দুঃখের দিন শেষ হয়ে এলো।

-কিছুই হবে না ভাবি। স্বামী সম্মান না করলে ছেলে-মেয়েও করে না।

-আমার তো কেউ নেই। শুধু স্বামীর ভিঁটের গন্ধ শুঁকে পড়ে থাকি।

-একদিন সব তোমার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে চলে যাবো।

হাসে রোশেনারা। বলে, এইবার ওঠ তো বোন, রান্না ঘরে যা। বাজার এনেছে আলী।

-আজ তুমি রান্না করো। আমি রাঁধবোও না, খাবোও না।

-পাগল! স্বামী থাকলে সংসার থাকে। সংসার থাকলে, অশান্তি থাকে। দ্যাখ আমার স্বামী নাই, অশান্তিও নাই। সন্তান নাই, স্বপ্নও নাই।

-আমার আবার কি স্বপ্ন দেখলা তুমি ভাবি?

-স্বপ্ন নাই? নাতি নাতনি পোতা পুতনি হবে। তাদের আদর সোহাগ করে কলিজা ঠাণ্ডা করতে পারবি। কিছুই মনে থাকবে না সেদিন ফাতিমা।

-তুমি কি আমাকে হিংসা করো ভাবি?

-কী যে বলিস! কিন্তু একটা কথা বলতো, আলীর সমস্যা কোথায়?

-তুমি জানতে চেও।

-নিজেই বলতে যাচ্ছিলো একদিন। বলতে দিইনি।

-আমি জানি। তোমাকে পেলে ও খুশি হতো। অপছন্দের এই আমাকে নিয়ে থাকার জন্যই রাগ ওর।

সেই ভাবি এতদিন পরে স্বপ্নে ফাতিমার কাছে এসে আবার সেই গল্প তুলেছিলো। আবছা শরীর থেকে কথা ভেসে আসছিলো। আলী বলেছিলো, আমি তো রাগ করি না ভাবি। রাগটা আমার ঘেন্নার প্রকাশ। যে সম্পর্কের ভিত্তিই ঘেন্না, সেখানে মিঠা কথা আসতে চায় না ভাবি।

কথাটা শুনে চার সন্তানের জননী ফাতিমার মনে হয়েছিলো, বুকের ভেতর একটা বোমা ফাটলো। চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে মরেই গেছে সে। কলিজা হৃদপিণ্ড ফুসফুস ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে নাক মুখ দিয়ে। ঘেন্নার সংসার করেছে সে? ঘেন্নার সন্তান ধারণ করেছে সে? এতো অসম্মান? এতো অপমান? হীনমান হতমানের ব্যথায় তার শরীরটা গলে খুলে খুলে যাচ্ছে। শরীরের লোমকূপগুলো পর্যন্ত ভিজে জবজবে হয়ে গেছে রক্তে। ইঁদুর মারা বিষ খেতে চেয়েছিলো। ভাবিই রক্ষা করেছিলো।

তারপরেও এই সংসারে দিন কাটিয়েছে বিস্তর। ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দিয়েছে। নাতি-নাতনি, পোতা-পুতিন হয়েছে। আদরে সোহাগে বুকে করে রেখেছে তাদের। আলী হঠাৎ মারা গেলো। দেখে গেলো না নাতি-পোতা। ভাবিও চলে গেলো বছর চারেক আগে। কিন্তু বুকের সেই ক্ষতটা থেকে গেলো কাঁচাই। ভাবির কথা ঠিক ছিলো না। নাতি-নাতিনকে বুকে নিয়েও ভুলতে পারেনি ফাতিমা সেই চরম অসম্মানের কথাগুলো। কিছুতেই ভোলা যায়নি।

এতোকাল পর আবার সেই গল্প কেন? সেদিনও কথাগুলো ফাতিমাকে না বললেই পারতো ভাবি। গোপনেই রাখতে পারতো ঘাতক শব্দগুলো। কিন্তু রাখেনি। ফাতিমা কষ্ট পাবে জেনেও বলেছে। তাই বলে আবারও স্বপ্নে সেই কথা! তার কষ্ট কি ভাবি উপভোগ করে? সেদিনও করেছে? সেই একই রকম কষ্ট হচ্ছে ফাতিমার। যেনো দেখতে পাচ্ছে, নিজের ফালা ফালা শরীরটা দড়িতে বাঁধা অবস্থায় ঝুলছে, দুলছে, রক্ত ঝরছে। ওটা কোনো মানুষ নয়। সবটাই ছিঁড়ে কেটে ফেলা কোনো প্রাণির শরীর মাত্র।

সুমনা এলো নানুর ঘরে। শীতের কমলা রঙ বিকেলে সোনালি পুতুলের মতো রাজকন্যা। প্রাণ ভরে গেলো ফাতিমার। কিন্তু এ কী! আজ তো তার কাঁদার কথা সুমনার সামনে। কিন্তু সুমনাই কাঁদছে নানুকে জড়িয়ে ধরে।

-কী হয়েছে রাজকন্যা? বল না? কাঁদছিস কেন?

ধীরে ধীরে সবই বললো নানুকে সুমনা। ভালোবাসার মানুষ তাকে প্রতারণা করে অন্য মেয়েকে বিয়ে করেছে। এদিকে তার পেটে প্রেমিকের সন্তান। উপায় না দেখে সে 'এম আর' করে নিজেকে মুক্ত করেছে। প্রথম সন্তান শুধু নয়, হত্যা করেছে ভালোবাসার সন্তানকে। তঞ্চকের প্রবঞ্চনার ব্যথা আর বিফল মাতৃত্বের অসহায়ত্ব তাকে পিষে মারছে। সান্ত্বনা পাচ্ছে না

কোথাও। সুমনার ভাষায়, কষ্টে যন্ত্রণায় ব্যথায় দেহ মন খুলে খুলে যাচ্ছে। সীমা ছাড়িয়ে গেছে যাতনা। দুঃসহ হয়েছে জীবন। আর বাঁচতে চায় না সে। নির্জন বাড়িতে নানুর কোলে মাথা রেখে আকুল হয়ে কাঁদছে সুমনা।

ফাতিমার মনে হলো, পৃথিবীটা উল্টে পড়ে গেছে অতীতের দহে। সুমনা নয়, সে নিজেই কাঁদছে কিশোরী সুমনা হয়ে। সেই বঞ্চনা, সেই তঞ্চক চরিত্র, সেই বিফল মাতৃত্বের বেদনা, সেই অসহ্য জীবন, সেই সান্ত্বনাহীন সময়! সেই অসম্মান! ঝাঁঝরা কলিজার ক্ষরণ! কেমন করে হয়? শুধু ঘটে যাওয়ার প্রক্রিয়াটা আলাদা। এই বিপুল ব্যথা সইবে কেমন করে সুমনা?

সুমনাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করে নানু। এই প্রথম মনে হলো, তার কোনো দুঃখ নেই। ব্যথা নেই। সাধ্যের মধ্যে জমিয়ে রাখা সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে বাঁচাতে হবে সুমনাকে। তারা যা পারেনি, সুমনাকে তাই পারতে হবে। পারতেই হবে। তার মতো করে জীবন নির্বাহ করতে দেয়া যাবে না মেয়েটাকে। কিছুতেই না।

অস্তিত্ব সংকট

মাসুমকে বোঝা মুশকিল। হাসি খুশি মানুষ। কিন্তু সিরাজুল বলে, ওর পেটে নাকি জিলেপির প্যাঁচ। কেন বলে সেই জানে। অথচ ওর সাথেই বেশি দেখা যায় সিরাজুলকে। অনেকে বলে, মাসুম আর সিরাজুল মানিকজোড়। সবখানেই দেখা যাবে দুইজনকে একসাথে। আমারও ভাব আছে ওদের সাথে। একসাথে থাকতে গেলে যেটুকু একান্তই দরকার। গত সপ্তায় ওকে নাকি মাসুম বলেছে সিরাজকে, তোদের সাকি ভাইয়ের একটু দাদা দাদা ভাব, তাই না রে?

-আমি এত শত বুঝি না ভাই। খুব নির্বিকার ভাবে বলে সিরাজ।
-থাক, বাদ দে। এমনি বললাম।
-তোর না এই এমনি এমনি কথা বলাটা একটা রোগ মাসুম।
-ওসব তুই বুঝবি না দোস্ত। দেখিস, একদিন ঠিক টের পাবি।
-পেলে তোকে জানাবো। ঠিক আছে?
-তোকে কিছু বলা মানেই ভুল।
এমন অর্থহীন খুনশুঁটি লেগেই থাকে ওদের।

এইটুকু কথা সিরাজ আমাকে না বলে পারেনি। কেন বলেছে, তাও বুঝিনি। সত্যি জটিল। গলায় গলায় ভাব দুজনের। কথাটা বলেই আমাকে সতর্ক করে দিয়েছে, মাসুম যেনো না জানতে পারে। মনে মনে হাসি। মাসুম আরও বলেছে, ওদের দুজনের ভাব দেখে নাকি আমি হিংসে করি। মাথা খারাপের কথা! ভাবি, ওদের কি অন্য কাজ নেই? এমন কেন ওরা? কীভাবে, আর কি বলে, কিছুই বুঝি না আমি।

আমার নাম সাকিবুল ইসলাম। এই দলটার মধ্যে সিনিয়র। আদুভাই ক্যাটাগরির। ছয় বছর ধরে এম.ফিল. করছি। রোজগারের ধান্দায় কাজ

এগিয়ে নিতে পারছি না। সবাই ডাকে সাকি ভাই বলে। তার আগে ব্রেক গেছে দু বছর। এখন তো আট দশ বছর পরেই জেনারেশন গ্যাপ হয়ে যায়। তবু কীভাবে যে এদের সাথে আমার ভাব হয়ে গেলো। ওই সিরাজুল, মানে সিরাজই ছিলো হোতা। চা কফির আসরে টেনে নিয়ে যেতো আমাকে। বলতো, আমরা লাকি, একজন সিনিয়র ভাই আছেন আমাদের সাথে। চা শিঙাড়ার দাম দিতে গেলে হাঁহাঁ করে উঠতো। কখনও জোর করে দিয়েছি, কখনও পারিনি। মাসুম খুব এনজয় করতো আমাদের এই জোরাজুরি। কোনোদিন আমাদের খুনসুঁটির ফাঁকে টুক করে সে দাম মিটিয়ে দিতো। সে আবার আমাকে দাদাগিরির মধ্যে ফেলেছে কি দেখে? দুর্বোধ্য!

বোঝা যেতো, মাসুমের আর্থিক অবস্থা বেশ ভালো। কিন্তু আমি তো সিনিয়র। কিছু আয় রোজগার আমারও আছে। খুচরো খাওয়া দাওয়ার টাকা আমারই দেয়া উচিত মাঝে মাঝে। বিশেষ করে নতুন ছেলে দুটোর বাড়ির অবস্থা খারাপই মনে হয়। একসাথে থাকলে এসব টের পাওয়া যায়। মহম্মদপুরের বাসাটাও আমিই ঠিক করেছি। চারটা বেড়রুম। দুটো বাথরুম। রান্নাঘর, সাথে একটা লম্বা ব্যালকনি। আমরা আটজন থাকি বাসাটায়। ছোটো ভাই নাকিবকে নিয়ে একাই থাকতাম একটা ছোটো বাসায়। সেই বুদ্ধি দিলো, বড়ো বাসা নিয়ে কয়েকজনে মিলে থাকার জন্য। তাতে সাশ্রয় হবে। কথা ঠিক।

মফস্বল থেকে এসে এইভাবে বাসা ভাড়া করে থেকে লেখাপড়া করার চলন খুব বেশিদিনের কথা নয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দান এটা। উচ্চশিক্ষার জন্য ঢাকায় আসতে হবে। থাকতেও হবে। পর্যাপ্ত হল হোস্টেল নেই। আত্মীয়ের বাসায় থাকা কয়জনের ভাগ্যে হয়? ঠ্যাকায় পড়ে মানুষ বের করে নিয়েছে সমাধান। শুধু ছেলেরা নয়, মেয়েরাও বাসা ভাড়া করে কয়েকজন মিলে থাকছে আজকাল। তাদের জন্য হল হোস্টেল আরও কম। লেখাপড়া করছে। বন্ধে বাড়ি যাচ্ছে। অনেকেই টুকটাক কিছু করে আয়ের চেষ্টা করে। তারমধ্যে টিউশনই প্রধান। পাশাপাশি বেড়ানো, সিনেমা দেখা, আড্ডা দেয়া চলে। উঠতি বয়সিদের শিক্ষা জীবনে এক ধরনের স্বাবলম্বিতার নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠছে খুব দ্রুত। ভালোই লাগে আমার। প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা সাহসী এবং স্বাবলম্বী হচ্ছে।

তো আমাদের বাসায় একটা বুয়াও রাখা হয়েছে। সে সকালে আর বিকেলে রান্না করে দিয়ে যায়। তাতে সমস্যা একটাই। যে আগে খায় সে একটু

বেশিই খেয়ে ফেলে। ফলে বুয়াকে বাড়তি দায়িত্ব দেয়া হলো। রান্নার পর বাটিতে বাটিতে তরকারি বেড়ে রাখার কাজটাও সে করতো। বেশ কিছুদিন ভালোই চললো। বুয়ার সাথে চুক্তি, সে খাবার নেবে না। বেতন নেবে শুধু। তবু রাতের খাবার কিছু থাকলে তাকে দেয়া হতো। তরকারি তো থাকতো না, কিছু ডাল ভাত থাকতো মাঝে মাঝে।

কিন্তু বিভিন্ন জায়গার আটজন তরুণ অচেনা ছাত্র, একটা বাসায় মিলে মিশে শান্তিতে থাকবে, এটা বেশ কঠিন ব্যাপার। আরও কঠিন হয়, কারও বন্ধু খাওয়ায় সময় এসে গেলে। পান-বিড়ির দোকান থেকে দুটো ডিম এনে ভাজি করে সমস্যা মেটানো যায়। কিন্তু বাজার সদাই তো সব এজমালি। তেল লবণ মরিচ এবং গ্যাস খরচের হিসেবও রাখতে হয়। দারিদ্রের কালো দিক এগুলো। চা কফি সিঙাড়া উজাড় করার সময় দিলদরাজ ভাব। কিন্তু বাসার এজমালি সম্পদের বেলায় টনটনে। ছেড়ে কথা বলে না কেউ।

প্রতি মাসে বাজারের দায়িত্ব ঘুরে ঘুরে পড়ে ছেলেদের ওপর। ঝামেলা শুরু করলো সাজু। নতুন মুখচোরা ছেলেটা। মাঝে মাঝেই সে দুপুরের মিল বাদ দিতে লাগলো। আগে বলে কয়েও না। ফলে রান্না হয়ে যেতো খাবার। বাধ্য হয়ে বুয়াকে দেয়া হতো সেই খাবার। পরের মাসে সাজু বলে বসলো, গতমাসের পাঁচটা মিলের টাকা সে কম দেবে। যে খাবার সে খায়নি। সেই খাবারের টাকা সে দিতে রাজি নয়।

সবচেয়ে বেশি রিএক্ট করল মাসুম। বললো, আমি ঠিক জানতাম সাজু এমন একটা কথা বলবে। জটিল ছেলে। মন খুলে কারও সাথে কথা বলে না। যেনো কোনো লাটের বাচ্চা। কাল বাড়ির গেটে দেখা হলো, কথাই বললো না। যেনো চেনেই না।

আমি বলি, প্রথমেই এতো কঠিন কঠিন কথা না বলে, আমাদের যৌথ জীবনের বিষয়টা বুঝিয়ে বলা দরকার ওকে।

-সব সময় এতো ভালো মানুষি ভালো না সাকি ভাই, মাসুম বলে।

-ও একটু চুপচাপ ঠিকই। কোনো সমস্যাও তো থাকতে পারে।

-সমস্যা তো আছেই। নিজের সম্বন্ধে তার খুব উঁচু ধারণা।

-সে থাকতেই পারে।

-সবাইকে সে প্রতিযোগী মনে করে। যেনো কি একজন নোবেল লরেট!

-এসব আবার কী কথা?

-ঠিক বলছি সাকি ভাই। একটা মেয়ের সাথে মাত্র পরিচয় হয়েছে, তাকে বলেছে, তার মতো খাঁটি ছেলে নেই এই ক্যাম্পাসে।

-এই সংবাদ আবার কোথায় পেলে মাসুম?

-মেয়েটা আমাদের সেকশনেই পড়ে। সে, মানে চৈতিই বলেছে আমাকে।

-তুমি থামো তো মাসুম। হেসে ফেলি আমি। বলি, একসাথে থাকতে গেলে ছোটো খাটো কতো কিছু হতে পারে। আপোসেই মিটিয়ে নিতে হয় সেগুলো।

-আরও কথা আছে সাকি ভাই, ওর নাকি এখানকার রান্না ভালো লাগে না। বাড়িতে যেনো রোজ মোগলাই খানা খেতো।

-আহা, তুমি এতো রেগে আছো কেন সাজুর ওপর? ওর কিছু বলার থাকতে পারেই তো। না?

-ও একটু বেশি বেশি কথা বলে। একদিন এমন গর্তে পড়বে না! বুঝবে সেদিন।

-এই বয়সেই রাষ্ট্রচরিত্র পাচ্ছো? হাসি আমি।

-মানে কি, সাকি ভাই?

-কাউকে বাক স্বাধীনতা দিতে চাও না, এই আর কি। কথা বলতে না দিলে মারামারি করবে।

-না মানে কি, ওর নাক উঁচু নাক উঁচু ভাব আমার একটুও সহ্য হয় না সাকি ভাই।

এই রকমই এরা। হয়তো বিকেলেই দেখা যাবে, ক্যাফেতে বসে বসে কিছু খাচ্ছে দুইজনে মিলে। বুঝতেই পারি না ওদের। মুখে এক, মনে এক, চিন্তায় এক, যাপনে এক। বিচিত্র! কেমন যেনো! আসলেই জেনারেশন গ্যাপ হয়ে গেছে ওদের সাথে। বোকা বোকা লাগে নিজেকে।

যাই হোক, আমি কোনো রকমে ব্যাপারটা সামলে নিলাম। সিনিয়র হলে কিছু দায় এসেই যায়। কিন্তু মাসুমের ব্যাপারটা আমাকে ভাবিয়েই রাখলো। বুঝতে পারলাম না। ও তো সবার সম্বন্ধেই নেতিবাচক কথা বলে। সিরাজ চলে যাওয়ার পর থেকে সাজু হয়েছে চোখের কাঁটা। কারণ কী? ওর সামনে কাউকে ভালো বললে তার সম্বন্ধেও একটা কিছু বলবে। এইতো দিলুর সাথে কী ভালো বন্ধুত্ব, অথচ দিলুর প্রশংসা শুনতে পারে না। শুধু এইই নয়, কারও প্রশংসা শুনলে ও নিজেকে গুটিয়ে নেয়। নিজে তো কারও সম্বন্ধে ভালো কথা বলেই না। সমস্যা কোথায় ওর?

এটাই কি অস্তিত্ব সংকট? আইডেনটিটি ক্রাইসিস? সব সময়ে নিজেকে আক্রান্ত মনে করে। ভাবি, এরা দুনিয়ায় করে খাবে কীভাবে? গায়ের চামড়া এতো পাতলা হলে চলে?

কদিন পরে দেখা হলো সাজুর সাথে নিউ মার্কেটে। শ্যামলা মিষ্টি একটা মেয়ের সাথে ঘুরছে। শাড়ি পরলে হয়তো একটু বয়সি লাগতো। সালোয়ার কামিজ পরে আছে। মনে হয় স্রেফ বালিকা। লাউ ডগার মতো লিকলিকে শরীর। লম্বা দুটো বেনী পিঠের ওপর ঝুলছে। তাতেই আরও কচি দেখাচ্ছে ওকে।

এড়িয়ে না গিয়ে এগিয়ে এলো সাজু। বললো, সাকি ভাই, এর নাম চৈতি।

-বাহ! সুন্দর নাম তো। হেসে বলি।

চৈতি সালাম দেয়। বলে, সাজুর কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি সাকি ভাই।

হাসে চৈতি। অসাধারণ মিষ্টি হাসি। দুপাশে দুটো গজদন্ত চৈতির হাসিকে আরও মোহনীয় করেছে। প্রথম দর্শনেই ভালো লাগে মেয়েটাকে আমার।

-দেশ কোথায় আপনার? আমি জানতে চাই।

লজ্জায় কাঁচু মাচু হয়ে চৈতি বলে, পা ছুঁয়ে সালাম করতে পারবো একশো বার, কিন্তু আপনার কাছ থেকে 'আপনি' সম্বোধন নিতে পারবো না সাকি ভাই।

- চমৎকার করে কথা বলো তো দেখি। ওরা দুজনেই হাসলো।

সামনেই আইস্ক্রিমের প্রিয় দোকানটা। আমি ওদেরকে আইস্ক্রিম খাওয়াতে চাইলাম। খুব খুশি হয়ে রাজি হলো। বেশ কাটলো সন্ধেটা। আমি তো সাজুর মধ্যে সমস্যা কিছু দেখলাম না। নাক উঁচু তো নয়ই। বরং বেচারার নাকটা দুঃখজনকভাবে বোঁচা। ইচ্ছে করে কিছু সময় কাটিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম। কেন যে মাসুম আবোল তাবোল বলে! পরস্পরকে বোঝার ক্ষমতাও কি কমে গেছে এদের? নাকি কিছু মিন করে বলে না? অবাক লাগে।

বললাম, তোমরা তো মাসুমের সাথেই পড়ো, না?

-একসাথে, কিন্তু এক সেকশনে না, সাজু বলে।

-তাই? মাসুম বলেছিলো, এক সেকশনে পড়ো।

-মাসুম কে, সাজু? চৈতি জানতে চায়।

-ঐ যে ছেলেটা তোমাকে দেখে স্যারের নোট চাইলো, সাজু বলে চৈতিকে।

-চিনতে পারলাম না।

-থাক, চিনতে হবে না।

-আমাদের সাথে একই সেকশনে বসে?

-না, ও বি সেকশনে। একদিন বসেছিলো ভুল করে। ব্যাকব্রাশ করা চুল। বেশ লম্বা।

-এখনও চিনলাম না সাজু।

-আর কী বললে তুমি চিনতে পারবে? বেশ বিরক্ত সাজু।

-রেগে যাচ্ছো কেন ভাই? চৈতি মিষ্টি করে বলে।

-অন্য সেকশনের ছেলেকে তুমি চিনবে কী করে বলো তো?

-ওর সম্বন্ধে আর একটু বলো না। হয়তো চিনতে পারবো। আফটার অল একসাথে পড়ি তো, না?

-ওকে চিনে তোমার লাভটা কি হবে?

-সবটাতেই তোমার দোকানদারের মতো লাভ লোকসানের হিসাব। এমন কেন তুমি? অভিমান চৈতির কণ্ঠে। টলোমলো দুই চোখ। খুব অভিমানী মেয়ে বোঝা যায়।

-আমার সব বন্ধুকে তোমার চেনার দরকার নেই, বুঝলে। কেমন শাসন শাসন ভাব।

একটা ভজকট লেগে গেলো। এই আর এক রূপ ওদের। কী থেকে যে কী হয়! হঠাৎ বাতাসে বদ গন্ধ বয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। কী সুন্দর সময়টা কাটছিলো! ওদেরই ক্লাসমেট মাসুম। ওর নাম নেয়া মাত্র ছিঁড়ে গেলো তানপুরার সবকটা তার। মাসুম আর সাজুর সম্পর্কটা তাহলে ভালো নয়। কিন্তু দেখায় তো অন্য রকম।

অবাক হয় সাকিব। মাসুম এমনভাবে চৈতির কথা বলেছিলো, যেনো তারা দুজন দুজনকে খুব চেনে। কিন্তু মনে হচ্ছে, চৈতি মোটেই চেনে না ওকে। আর সাজু তো প্রায় ছ্যাঁত করে উঠলো। সদ্য মফস্বল থেকে আসা নতুনদের সাথে কথা বলাই বিপদ দেখা যায়। কথায় মেজাজে পরিশীলন বলতে কিছু নেই। ঠাস করে রেগে যায়। স্থান কাল পাত্র কিছুই দেখে না। কবে যে এগুলো নাগরিক ভব্যতাটুকু শিখবে?

বিরক্ত হয় সাকি মাসুমের ওপর। নিজেকে সবজান্তা ভাবে তুলে ধরতে চায়। চরিত্রের এই জিনিসগুলো মাঝে মাঝে অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি করে। আসলে এই সবজান্তা ভাবটাও একরকম হীনমন্যতা। নিজেকে অযথা বড়ো করে দেখানোর ইচ্ছে। অস্তিত্ব সংকটের উৎস তো মনের এই ফাঁকা জায়গাগুলোই।

সাপের মতো এঁকেবেঁকে যাচ্ছে নিরীহ নিরুত্তাপ দিনগুলো। সাজুকে বেশি দেখা যায় না আজকাল। চৈতিকেও দেখি না। বাবার চিঠিটা নিয়ে আমি বেশ ব্যস্ত। দুএকটা টিউশন বাড়ানোর চেষ্টা করছি। পেয়েও গেলাম পটাপট তিনটা। অবসর সময়ের সবটুকু খেয়ে নিলো টিউশন। সামনেই গরমের ছুটি। এবার কে থাকবে বাসার দায়িত্বে, সেটা নিয়ে বসতে হবে। দেখা যাক।

বিশ্রী গরম পড়েছে। ঘুম আসে না সাকির। মধ্যরাত পার হয়ে গেলো। রুমমেট চুপি চুপি এসে শুয়েছে। টের পেয়েছে সাকি। ভাবলো, ওর কাছে সাজু আর চৈতির কথা জিজ্ঞেস করবে। ভারি মিষ্টি মেয়ে। হাসিটা আরও

মিষ্টি। আবার ভাবছে, কী জানি কী মনে করে, আজকালকার ছেলে-মেয়ে। হয়তো বলেই বসবে, গভীর রাতে সাকিভাই চৈতির খবর শুনতে চায়। অনায়াসে বলে ফেলবে এরা। দুবার ভাববে না।

ঘুম ঘুম এসেছিলো। এমন সময় ফোন বাজলো। স্মার্ট ফোনের স্ক্রিনে মাসুমের ছবি। ও তো আমাকে ফোন করে না কোনোদিন! শুয়ে শুয়েই ফোনটা ধরে সাকি।

-হ্যালো, এত রাতে? কী খবর?

-সাকি ভাই, চৈতি সুইসাইড করেছে। বজ্রপাত হলো কানে।

-কী বলছো? কে বলেছে তোমাকে?

-কাল তুমুল ঝগড়া হয়েছিল দুজনের মধ্যে।

-তুমি এত কথা জানলে কী করে?

-বন্ধুরা সবাই জানে।

-তুমি জানলে কখন?

-নাজিয়া, চৈতির বন্ধু ফোন করেছিলো আমাকে। গিয়েছিলাম। কথা বলতে পারিনি। কেমন এক অপরাধবোধে মরে ছিলাম। গলাটা ধরা ধরা। কান্না চাপা স্বর।

মুহূর্তে মনে পড়ে সাকির, সেদিন অভিসম্পাত দিচ্ছিলো, কপালে দুর্গতি আছে বলে। আজ সাজুর দুর্দিনে আবার কাঁদছে। কাকে কী বলবে সে?

ধড়ফড় করে উঠে বসে সাকি বিছানায়। কি বলে এইসব? একটু ঝগড়া হলো, কি না হলো, অমনি গলায় ওড়না পেঁচিয়ে ঝুলে যেতে হবে? জীবন এতোই সস্তা? নিজেকে এরা এতোই ছোটো মনে করে? লেখাপড়া শিখে তাহলে কী হলো? ফেল করলে আত্মহত্যা, টিচার কুকথা বললে আত্মহত্যা, টিচার মা-বাবাকে অপমান করলে আত্মহত্যা, ইভটিজিঙের জন্য আত্মহত্যা, পরকীয়ার জন্য আত্মহত্যা, প্রেমিকের সাথে ঝগড়া হলে আত্মহত্যা, এসবের মানেটা কী? পরাজিত হওয়ার জন্য মানুষের জন্ম হয়নি, এটুকুও শেখেনি? মা বাবার কাছে কোনো দায়বদ্ধতা নেই? তারা

শুধু চাহিদা মোতাবেক ভাত কাপড় টাকা দেয়ার গোঁসাই? পাগল হয়ে যাবো।

হাতে ফোনটা তখনও অনলাইনে। স্ক্রিনে মাসুমকে দেখা যাচ্ছে। কিছু বলছে। ভিডিও কল ছিলো।

-সাকি ভাই আপনি একবার আসেন। সাজু আপনাকেই খুঁজছে। কেঁদে ফেলে মাসুম। বলে, সাজুর জন্যে এমন কিছু আমি চাইনি সাকি ভাই। সেদিন যা বলেছি, তা ছিলো কথার কথা। বিশ্বাস করেন সাকি ভাই।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে ছেলেটা শিশুর মতো।

অসূয়া কন্যা

পরমা ভেবেছিলো, বেলা দিদিকে দিয়েই তার অবাক হওয়ার পালা শেষ হবে। আহ, কী যে কষ্টকর ছিলো সেই অবাক হওয়ার ঘটনা মেনে নেয়া! কিন্তু কিছু করার ছিলো না তার। প্রায় এক বছর সে ছটফট করেছে। মন থেকে মেনে নিতেই পারেনি। শয়নে স্বপনে ধ্যানে জ্ঞানে বুকচাপা একটা অস্থিরতা তাকে তাড়া করে ফিরতো। শুধু ভেবেছে, কি করে এমনটা হতে পারে? যিনি কাছে পেলে তাকে কন্যার স্থানে বসিয়ে আদরে আর ভালোবাসায় ডুবিয়ে দিতেন, সেই বেলা দিদির কাছ থেকে এমন কাণ্ড? তিনি যে কোনো দিন তাকে হিংসে করতে পারেন, এটা শুধু অবিশ্বাস্য নয়, ছিলো প্রশ্নাতীত।

আজ প্রায় এগারো বছর হলো বেলা দিদি চলে গেছেন অচিন ঠিকানায়। সেই দুঃখ তো আছেই। মাঝে মাঝে পরমার খুব কাছে এসে দাঁড়ায় একেবারে। পনেরো বছরের মা-মেয়ে সম্পর্কের দিকে একটা মোটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন তুলে ধরে পতাকার মতো। সে দিকে না তাকিয়ে পারা যায় না। বুক নিংড়ানো একটা গভীর শ্বাস বেরিয়ে আসে এখনো। বড্ড ভালোবাসার মানুষ ছিলো পরমার। পরমাও ছিলো তার। তবুও কী যে হলো!

এতদিন পর আবারও একই রকম ঘটনা ঘটতে যে পারে সেটার ব্যাখ্যা দেয়ার কোনো ভাষা নেই পরমার। কষ্ট নয় বিস্ময়ে বোধহারা হয়ে যায়। এমনটা কেন হয় তারই সঙ্গে? তাই বা ভাবছে কেন সে? নিশ্চয় এমন ঘটনা আরো আছে, কিন্তু সে জানে না। শোনেনি কোনোদিন। হয়তো বা কেউ এমন অভিজ্ঞতার কথা অন্যকে বলতে চায়নি। তাই-ই হবে। কারণ, সেও তো বেলাদিদির কথা বলতে পারেনি কাউকে। ব্যথাটা গোপন সম্পদের মতো শুধু আগলে রেখেছে বুকের মধ্যে। কেউ যেনো দেখতে না পায়, বুঝতে না পারে এমন একটা ভাব। ওটা যেনো নিজেরই লজ্জা। নিজেরই

হতমান। কিন্তু ঘটনা তো সত্য। কে বলে, সব সময় সত্য কথা বলতে হয়? জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছে, সব সত্য সুন্দর নয়। এবং সব সত্য বলাও যায় না। তাহলে ছোটো বেলার সেই আপ্ত বাক্য 'সদা সত্য কথা বলিবে' এতো বড়ো ভুল? সেটাও কি সে জানে না? হয়তো সবাই জানে এবং জেনেও না জানার ভান করে। জীবনের পথে চলতে গেলে কখনো কখনো ভান যে করতেই হয় কিছু। তাই সোনাতেও খাঁদ মেশাতে হয়, নইলে গয়না গড়া যায় না।

মহিলার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিলো নন্দন সুপার মার্কেটে। তেমন কিছু কেনা কাটার ছিলো না পরমার। এসেছিলো মশলা কিনতে। কচুর ডাঁটা রান্না করবে তাই রাঁধুনি চাই। দোকানের লোক চিনতেই পারলো না রাঁধুনি মশলা। মোট কথা পাওয়া গেলো না। একেবারে খালি হাতে ফিরবে না বলে পাঁচ লিটারের একটা ব্র্যানঅয়েল নিলো। লাগবেই তো আগামী মাসে। হঠাৎ মনে হলো প্লাস্টিকের কন্টেইনারগুলো দেখা যেতে পারে। এই আর এক প্রয়োজনের জিনিস। কোনো কাজে না লাগে! ওখানে গিয়ে দেখে, এক সুশ্রি মহিলা ব্যাগে ভরে নেয়ার জন্য অনেক সাইজের অনেক কন্টেইনার বেছে রেখেছে। ওগুলোর পরিমাণ দেখে হেসে ফেলে পরমা। ঘাড় ঘুরিয়ে পরমাকে দেখে মহিলাও হাসে। বলে, এগুলো যে কী কাজের ভাই, তা আর কী বলবো!

-এ তো অনেক, পরমা বলে ফেলে।

-আমি জানি, আগামী মাসে আবার আমাকে এতোগুলোই কিনতে হবে ভাই, কেমন এক অসহায় ভাব ফুটে ওঠে মহিলার চেহারায়।

-তার মানে?

-মানে, যাকেই রান্না বা কাঁচা কিছু দিই, সেটা আর ফিরে আসে না। চাওয়াও যায় না, সামান্য জিনিস।

দুজনেই হাসে এবার। সেদিনই নন্দন থেকে ফেরার সময় মহিলা জোর করে পরমাকে তার বাসায় নিয়ে গেলো। নাম জানা হলো মহিলার। ওর নাম মৌ। বর ওকে ডাকে বৌ বলে।

প্রেম হয়ে গেলো দুজনের। যেনো এটা এমনিভাবে হঠাৎ করেই হওয়ার ছিলো। দেখা হলো, দুজনে একসঙ্গে হাসলো, চোখে চোখে চাইলো, ব্যাস ক্লিক করলো।

বেলা দিদির ব্যাপারটা কিন্তু তেমন ছিলো না। ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টে। পরে এক সময় বেলাদিদির উদ্যোগে তিন সপ্তার একটা ফেলোশিপ জুটেছিলো পরমার। উনি হস্টেলে থাকতে দেননি। নিজের বাসাতেই রেখেছিলেন প্রায় পঁচিশ দিন। কী অসাধারণ কেটেছিলো সময়, তা বলার নয়! অনেকেই অবাক হয়েছিলো পরমা আর বেলাদিদির ঘনিষ্ঠতা দেখে। বিশেষ করে বয়সের ব্যবধান চোখে পড়তো। আজীবন কুমারি বেলা দিদি বলতেন, আমার বাংলাদেশি কন্যা। যাক, সে কথা বলছি পরে।

পাঁচ বছর কেটে গেছে। মৌ আর পরমার বন্ধুত্ব শুধু গাঢ়ই হয়নি, প্রসারিত হয়েছে দুই পরিবারের মধ্যে। দুজনেই শ্যামলিতে থাকে। বাসা কাছেই বলতে গেলে। খাবার দাবার আদান-প্রদান লেগেই থাকে। আসা যাওয়া তো ডাল ভাত। এমন কী দেশের বাড়ি থেকে কিছু এলে তারও ভাগ দেয়া নেয়া চলতো। কী অদ্ভুত আরামদায়ক একটা সম্পর্ক। মনটা ভরে থাকে পরমার। তার ওপরেও মাছি বসলো। কারণ সামান্য। মৌ-এর বাসায় পরমার রান্নার সুখ্যাতি হতো খুব। সেটা হাসাহাসি আর মজা করার বিষয় ছিলো। এমনও হয়েছে, বাসায় অতিথি আসবে তাই মৌ পরমাকে ধরে এনে রান্না করিয়ে নিয়েছে। ওর বর ইলিয়াস বলতো, বৌ, কপালগুণে তুমি এমন বন্ধু পেয়েছো।

একদিন মৌ বললো, হিংসে হচ্ছে বুঝি তোমার?

সায় দিলো পরমা, নিশ্চয় হচ্ছে, বুঝতে পারছো না?

উচ্চকণ্ঠে হেসে ইলিয়াস বলেছিলো, পাগল আর কী? লাভ তো আমারও।

- মানেটা কী হলো? পরমা জানতে চায়।

- ভালো মন্দ খাবার আমিই ভাগে পাই বেশি।

- মৌ-এর রান্না বুঝি বেশি পান না?

- পাইও, খাইও। তবে সে তো নিত্যকার খাওয়া। আপনার রান্না তো রোজ পাওয়া যায় না। বলে একা একাই হাসলো ইলিয়াস।

- পরমার রান্না রোজ খেতে হবে কেন? তুমি না একটা ইয়ে! মৌ একটু বিরক্ত হলো। বেশি আদিখ্যেতা হয়ে গেলো না?

পরমার কেমন যেনো মনে হলো। মাছ খাওয়ার সময় হঠাৎ গলায় কাঁটা বেঁধার মতো আচমকা একটা ঝাঁকি। নাকি সতর্ক ঘণ্টা?

- সত্যি বলছি বৌ, আজ তুমি কাচ্চি বিরিয়ানিটা ভালো করে শিখে নাও।

- ও, আমার রান্না আর বুঝি মোটে পছন্দ হচ্ছে না তোমার? মৌ বলে।

- আহা, সে কথা নয় বৌ। তুমি তো ভালোই রাঁধো। তবে তোমার বন্ধুর কাচ্চিটা খুব ভালো হয় কিনা, তাই আর কী। বেধে যায় কথা ইলিয়াসের।

অপ্রস্তুত হয় পরমা। বলে, ঠিক আছে ভাই, আপনি এখন ঘরে যান তো দেখি, আমরা দুই বন্ধু মন দিয়ে রান্নাটা সেরে ফেলি এবার। বেচারা চলেও গেলো।

মৌ কিছু বললো না। সায়ও দিলো না, হাসলোও না। শুধু বললো, রান্না তো তুমিই করছো, আমার নাম নিলে কেন?

-দুজনেই তো কাজ করছি, তাই না?

-মা-ও তোমার রান্না কাচ্চির খুব প্রশংসা করেন, মৌ বলে, আসলে তোমার কাচ্চি সত্যি সত্যি চমৎকার হয়।

-প্লিজ, বাদ দাও তো ওসব কথা, তুমি বেরেশতার বাটি আর কাঁচামরিচ নিয়ে এসো। একটু পরেই তো লাগবে।

কথাটা বলা মাত্র ইলিয়াস বেরেশতার বাটি নিয়ে হাজির। মৌ বলে, তোমাকে কে আনতে বলেছে? আমিই তো যাচ্ছিলাম।

-আসছিলাম তোমাকে একটা কথা বলতে, তো বাটিটা টেবিলের ওপর ছিলো, সেটা নিয়ে এলাম। দোশটা কী হলো বৌ?

-রান্নার সময় তুমি ঘুর ঘুর করো, এটা আমার মোটে ভালো লাগে না, জানো তো? মৌ কট কট করে বলে কথাগুলো।

ঘুর ঘুর শব্দটা কানে লাগে পরমার। গলার অছিশ্য কাঁটাটা আবার খচ খচ করে ওঠে।

যা হোক, রান্না হলো, অতিথিদের খাওয়ানোও হলো। কিন্তু মনের ভেতরে কোথায় যেনো একটা কী নড়ে চড়ে। বাড়ি এসেও ভালো লাগে না তার। সেটাই ছিলো শুরু। আর এসব ব্যাপার একবার শুরু হলে নদী ভাঙনের মতো ঝুর ঝুর করে মাটি ঝরে পড়তেই থাকে।

একদিন পরমার শাড়ির প্রশংসা করলো ইলিয়াস। পরমা হেসে বললো, এটা মৌ প্রেজেন্ট করেছে আমার জন্মদিনে।

-তাই? মৌ এর পছন্দ আছে তো!

-এত দিনেও বোঝেননি?

-বুঝবো কী করে বলেন? আমরা তো দুজনে এক সাথে গিয়ে শাড়ি কিনি। একা কিনলে কী হবে তা জানি না। দুষ্টু দুষ্টু হাসি মুখে।

মৌ পাশেই ছিলো। বললো, তোমার কেনা শাড়ি বুঝি আমি পছন্দ করি না? এবার জন্মদিনে তুমি একা গিয়েই তো আমার শাড়ি কিনলে।

-ভাই পরমা, আপনার জন্মদিনে আমিও কি একটা শাড়ি দিতে পারি?

-কী যে বলেন ইলিয়াস ভাই, জন্মদিন কবেই পার হয়ে গেছে!

-তাতে কী? চলো না মৌ, তোমাদের দুজনকে দুটো শাড়ি কিনে দিই।

-হলো কী তোমার? হঠাৎ শাড়ি কেনার সখ যে বড়ো!

-সখ হতে পারে না বৌ? কী সরল মুখ ইলিয়াসের! কণ্ঠে জড়তার লেশ মাত্র নেই।

-আদিখ্যেতা আর কী? জানো পরমা, আমি না ঠেললে উনার কিন্তু বাজারে যাওয়ার সময়ই হয় না। কথাগুলো হেসেই বলে মৌ। কিন্তু হাসির মধ্যে সেই আগের প্রাণ ছিলো কি?

পরমা বলে, কে নিচ্ছে শাড়ি? কি নিয়ে কথা বলছেন ইলিয়াস ভাই?

-ছাড়ো তো ওর কথা। চলো আমরা রান্নাঘরে যাই, মৌ বলে।

-তোমরা মেয়েরা বড়ো জটিল ভাই, নিরস মন্তব্য করে ইলিয়াস।

-আমি আজ যাই মৌ। ভাই আজ আর বোধ হয় রান্না করতে দেবেন না।

-আপনারা দুজনেই খুব পুরুষ বিদ্বেষী। থাকো তোমরা রান্না নিয়ে। আমি গেলাম বসুন্ধরা মলে।

-আবার রাগ দেখো কর্তার!

পরিবেশটাই মেটে হয়ে গেলো। ভালো লাগেনি পরমার।

আর একদিনের কথা। খালাম্মা, মানে মৌ এর শাশুড়ি বললেন, আমি সব সরঞ্জাম কিনে রাখবো, একদিন গাজরের কেক বানাও তো মা।

মৌ বলে, আমাকে বলেননি কেন মা? আমিও তো গাজরের কেক বানাতে পারি। ওর সংসার আছে না? সেখানে কাজ থাকে না? মৌ এর মুখের রেখায় বিরক্তি ঢাকা যায় না।

-ঠিক আছে, আমি করে আনবো খালাম্মা। তা আপনাকে সরঞ্জাম কিনতে হবে কেন? তোমাকেও কষ্ট করতে হবে না মৌ। আমি গাজরের কেক করে আনবো খালাম্মার জন্য।

-মা না মাঝে মাঝে ওই রকম কথা বলেন, যেনো তুমি ছাড়া আর কেউ গাজরের কেক বানাতে পারে না। আজও কথাটা মৌ হেসেই বলে, আমার বেকিং এখন কি তবে মার-ও ভালো লাগছে না?

ভালো লাগে না পরমার এমন কথা। হচ্ছে কী এসব? ঠাণ্ডা যুদ্ধ শুরু হলো নাকি? মৌ কি তাকে হিংসে করছে? পারলে মৌ নিজেই সারাদিন প্রশংসা করে তার। এখন খালাম্মা বলছেন তো ছ্যান ছ্যান করে উঠছে। যন্ত্রণা! মানুষের মন বোঝা সত্যি ভার।

আবার গল্পে গল্পে একদিন বললো, তোমার কথা উঠলে আমাদের বাড়ির সকলে পঞ্চমুখে প্রশংসা করে। রাঁধা, সেলাই, চমৎকার ছড়া লেখা, তোমার শাড়ি পরা, তোমার...

-একটু থামো তো ভাই। এসব কথা শুনতে ভালো লাগে না। আমার বাড়িতেও তোমার যথেষ্ট প্রশংসা হয়। তুমি বলো, আমি বলি না।

-তাই বুঝি?

-অবশ্যই।

-বাব্বাহ জানতাম না তো!

-আচ্ছা, বলো না, আমার মাকে তোমার কেমন লেগেছে?

-সে আর কি বলবো? তুমি জানো না?

-জানি। তবু জানতে চাইলাম।

-খালাম্মা ইজ রিয়ালি আ গ্রেট লেডি। তোমার খুব গুণ গাইলেন।

-তাই? পরমা হাসে। মনে পড়ে, বাবা তার প্রশংসা করলে মা খুব একটা হ্যাঁ বা না করতেন না। পরিণত বয়সে জেনেছে 'মাদার জেলাসির' বিষয়টা। কী অবাক কথা, মা-ও হিংসে করতেন নিজের কন্যাকে! এখন কী যেনো হয়েছে, মা তার গুণের কথা বলে বেড়ান।

ক্লাসে বন্ধুরাও তাকে হিংসে করতো লেখাপড়ায় ভালো বলে। শ্বশুর বাড়ি এসে পেয়েছিলো দুইজন জা। তারাও নিরব হিংসের নিঃশ্বাস ছাড়তো। এলেবেলে হয়ে যায় মনটা। গুণ থাকা কি তাহলে ভালো নয়? অথচ লোকে গুণি মেয়েই চায় সংসারের জন্য। বড়ো বিচিত্র এই পৃথিবী।

মৌকে আজকাল কখনো কখনো অপরিচিত লাগে পরমার। সেই ভালো লাগা, সেই আরাম পাওয়া মেলামেশা, সেই অন্তর ছোঁয়া ভালোবাসায় কীসের ছায়া দেখে সে? মন মথিত করা একটা বড়ো নিঃশ্বাস পড়ে নিজের অজান্তেই। সম্পর্ক তবু আছে, চলছে ভালোই। হয়ত বেলাদিদির সঙ্গেও চলতো। তিনি তো সব ছেড়ে চলে গেলেন। বয়সও হয়েছিলো। অসুস্থ থাকতেন শেষ দিকে। ওপারে গিয়ে হয়তো এখন শান্তি পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর দেয়া চিকন একটা কষ্টের রেখা যে পরমার বুকে খোদাই হয়ে আছে। মুছতে পারে না কিছুতেই।

-এই কোথায় হারালে পরমা? মৌ বলে, কী হলো?

-কই নাতো? কিছু না।

-কী ভাবছো এত?

-বেলাদিদির কথা মনে পড়লো।

আবার ডুব দেয় পরমা নিজের ভেতর। দিদির বেলায় কিন্তু এরকম হয়নি। ওঁর মনে ধস নেমেছিলো ভেতরে ভেতরে। বুঝতে দেননি। পরমাও বুঝতে পারেনি। ভাবতো, দিদি তাকে খুব ভালোবাসেন বলেই বেশি বেশি আগলে রাখতে চান। তাই কোথাও যেতে দিতে চাইতেন না। কারো বাসায় দাওয়াত নিতে দিতেন না। প্রথম প্রথম মজা পেতো পরমা। হঠাৎই একদিন বিদ্যুৎ চমকের মতো ঝিলিক দিয়ে উঠলো দিদির কিছু কথায়।

দিদির বন্ধু কেতকি আর জয়ন্ত একদিন খুবই প্রশংসা করছিলো পরমার। লজ্জা পাচ্ছিলো পরমা। সে উঠে গেলো চা করতে। বিস্তর গল্প করে চা খেয়ে কেতকি জয়ন্ত চলে গেলো। কিন্তু দিদির মুখটা কেমন ভার ভার হয়ে রইলো। পরমা জানতে চাইলো, কী হয়েছে? শরীর ঠিক আছে তো?

একটু হেসে দিদি বললেন, তোমার 'কাটুম কুটুম ছা' বইটা নাকি এক পাবলিশার ছাপাবে, তাই বইটা চাইছিলো।

-দিতে চেয়েছো?

-না। স্পষ্ট নিপাট উত্তর।

-কেন দিদি?

-ওরা খুব ফাঁকিবাজ, পয়সা দেয় না।

-তা না দিক। কলকাতায় একটা পাবলিকেশন হতো।

-আর কতো প্রশংসা চাই তোমার গো?

-তুমি চাও না দিদি?

-অন্যে তোমার এতো প্রশংসা করলে আমার ভালো লাগে না।

-ও মা সেকি কথা? কী সব যে বলো?

-এতোকাল যারা শুধু আমার প্রশংসা করতো, তারা আমাকে আর দেখতেই পাচ্ছে না। তাই তো তোমার ছড়ার বই ওদেরকে দিইনি। তুমি শুধু আমার কন্যা পরমা। আর কারো নও।

তবু ভালো লেগেছিলো শুনতে। ওঁর বন্ধু বান্ধবদের বই দিলে এবং কলকাতায় একটা বই প্রকাশ হলে হয়তো পরমার যশ আরও একটু ছড়াতো। কিন্তু দিদি বললেন, খুব হয়েছে সুনাম, আর দরকার নেই। এরপর ওরা তো আমার কবিতা আর পড়বেই না।

-অবাক করলে দিদি, কোথায় তোমার লেখা আর কোথায় আমার?

-কেতকি তোমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো, এটাও আমার ভালো লাগেনি। তাছাড়া দেখো, ওরা কিন্তু আমার বই ছাপানোর জন্য চায়নি কোনোদিন।

মেঘে ঢেকে গেলো নাকি আকাশ? একটা হাল্কা ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেলো পরমার শরীরের ওপর দিয়ে।

-তোমার বই শুধু আমার কাছে থাকবে পরমা। আমি পড়বো বার বার। ওটাও আমার। একান্ত আমার।

আকাশের এ প্রান্ত থেকে ঐ প্রান্তে একটা বিদ্যুৎরেখা হঠাৎ চমকে উঠেই মিলিয়ে গেলো। যেনো ফেঁড়ে গেলো আকাশের অখণ্ড গা। কী এটা? ভালোবাসার দখল, না অন্য কিছু? শির শির করে ওঠে পরমার বুকের ভেতর। দিদি কি তাকে হিংসে করছেন? দিদির মনে তার প্রতি হিংসে? এও কি হতে পারে? আসলে পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। কিন্তু সম্পর্ক? সেখানেও কি স্থায়ি বলে কিছু থাকবে না? লেনাদেনা তো কিছু নেই, তবু এমন কেন হবে? হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দও ছিলো না কখনো। ওঠা বসা খাওয়ায় ছোঁয়া ছুঁত ছিলো না। যেনো জন্ম জন্মান্তরের আত্মীয়। পনরো বছর ভালোবাসার বায়বীয় অমিয় সুখ আজ টলছে কেনো? হতভম্ভ হয়ে গেছিলো পরমা। সুখের অম্ল দলা পাকিয়ে বুকের ভেতর জ্বালা করতে শুরু করলো। আহা, সে যে কি কষ্ট! কাউকে বলতেও পারেনি। হয়তো বিশ্বাসও করবে না কেউ।

পরমার মেয়ে ইন্দ্রাও আজকাল বলে, জানো মা তোমার মতো করে শাড়ি পরতে পারি না, তোমার মতো করে রুমালি রুটি করতে পারি না, তোমার

মতো উপমা (সুজির নোনতা খাবার) রান্না হয় না, এই সব বলে হাসে তোমার জামাই।

-তুই বলে দিস, কেউ কারো মতো হয় না এই পৃথিবীতে। দেখ না, এই আমিও নই আমার মায়ের মতো।

-ভাগ্যিস নও মা। তাই তো বলতে পারি, আমি মায়ের মতো হবো কেন? আমি আমার মতো।

কখনও সব ঘটনার যোগফল হিসাব করে পরমা। শেষে গিয়ে পায় একই উত্তর। হিংসে খাওয়া কপাল তার। লোকে বিশকন্যার গল্প বলে। বাবা বলতেন, আমার মা-টা হবে 'অসুয়া কন্যা'। এটাও বলতেন, লোকে যেনো হিংসে করে, যেনো না হাসে।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মনে হয়, বাবার কথা আংশিক ঠিক। আসলে বেশি হিংসেও ভালো না। কেমন এক অস্বস্তি লাগে মাঝে মাঝে। একান্ত আপন মানুষদের সাথে আরামদায়ক মেলামেশায় ছায়া পড়ে থাকে। ঝক ঝকে রোদ সেখানে আসতে চায় না। একেবারে ভালো লাগে না তার। এ কেমন কপাল তার?

বাসনা কুন্তল

মইনের বাড়ির সামনে গাড়ি পার্ক করে মোবাইলে সময় দেখে শুভ। প্রায় চল্লিশ মিনিট দেরি হয়েছে। নিশ্চয় শুরু হয়ে গেছে পার্টি। মইনের ষাট তমো জন্মদিনের পার্টি। মনটা খারাপ হয়ে যায় শুভর। তিন ঘণ্টা আগে বাসা থেকে বের হয়েও আসা গেলো না যথা সময়ে? মরার জ্যামেই খেলো জীবনটা! একা একা গজ গজ করতে করতে দরজায় এসে বেল বাজালো।

মইনই দরজা খুললো। জড়িয়ে ধরে দুজন দুজনকে। জানে জিগার দোস্ত দুজন। থাকে একই নগরে। একজন বসুন্ধরা, একজন ধানমণ্ডি। দূরত্বটা বেশি নয়। কিন্তু জ্যামের কারণে বহুদূর। দুই থেকে তিন ঘণ্টা সময়ের ব্যবধান। সেই কারণে আসা যাওয়া হয় কম। কিন্তু ফোনে যোগাযোগ থাকেই। তাই সয়ে যায় দূরত্ব।

-খুব দুঃখিত মইন।

-না না, ঠিক আছে। ভেতরে আয়।

অবাক হয় শুভ। শুধু তারা তারাই? এতো ছোটো পার্টি? বলে, কোহেন আসেনি?

-আসতে চেয়েছিলো। পরে জানালো, শরীরটা ভালো নেই।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে শুভ বলে, হুম, শরীরটা তো নিয়ে গেছে লাউরা।

-কিছু বলার নেই রে। এই বয়সে বৌ চলে গেলে, শরীরে মনে বিষয়টা মেনে নেয়াই মুশকিল, মইন বলে।

-বিয়েও করলো না, ছেলে মেয়েও নিলো না। বিয়ে করলে নাকি প্রেম নষ্ট হয়ে যায়। কী সব থিওরি! লিভটুগেদারেই কাটিয়ে দিলো জীবন। বলতো মইন?

-সত্যি, একটা সন্তান থাকলে হয়তো এতোটা নিঃসঙ্গ হয়ে যেতো না।

-সেই বিয়ে তো করলো, লাউরার ইচ্ছায়, লাউরার মৃত্যু শয্যায়।

-থাক শুভ, এখানে বস। চা না কফি?

-সত্যি থাকবে বাংলাদেশে কোহেন? প্রসঙ্গ টেনে নিয়ে যায় শুভ।

-কি যে বলিস! বাবা নেই, মা নেই, বোনের বাসায় থাকবে? হয় নাকি? একদিন এসেছিলো দেখা করতে। প্রথমে চিনতেই পারিনি। হঠাত বুড়ো হয়ে গেছে। মাথায় লম্বা লম্বা চুল।

-মানে? অবাক হয় শুভ। বলে, চিরকাল তো আর্মি ছাঁটে চুল কাটতো।

-সে অনেক কথা শুভ। আস্তে আস্তে বলবো।

অনিতা, মইনের বৌ এলো খাবারের ট্রে হাতে।

লজ্জিত হয় শুভ। বলে, ছি ছি, একি কাণ্ড! আমি টেবিলে বসেই খাবো অনিতা। শীলা আসুক না।

-পথে আছে। এসে পড়বে। ফোন করেছিলো। গুলশানের কাছেই জ্যামে বসে আছে। আমি বলে দিয়েছি, আপনি এসে গেছেন।

- এই এক জ্বালা। পিচ্চি নাতনিটার জন্য রোজ তাকে যেতে হয় উত্তরা। নানির ডিউটি করে। আমি এখন দুই নম্বর। হাসে শুভ।

-তাওতো আমাদের কপাল ভালো, নাতি নাতনিরা ঢাকাতেই আছে রে, মইন বলে।

-সত্যি। মায়ার বন্ধন। আসলে পরম্পরা ছাড়া জীবনের মূল্য কি? বল?

শীলা এসে পড়েছে। সবাই তাকে স্বাগত জানায়। মইনের বৌ আর শুভর বৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসমেট। যখন দেখা হয়, তখন সে কি বাঁধ ভাঙা গল্প!

শুভর মন পড়ে আছে কোহেনের কথা শোনার জন্য। তারা একসাথে ব্যাংকে চাকরি করতো। ঝকমকে ছেলে ছিলো কোহেন। একমাথা কালো কুচ কুচে চুলে আর্মি ছাঁট। বাম হাতে দুটো বড়ো পাথরের আংটি। ডানহাতে দামি ঘড়ি। চলাফেরায় আভিজাত্য। কথাবার্তায় কেতাদূরস্ত। বিশ পঁচিশজনের ভীড়ে ওকে চোখে পড়বেই। বিদেশে চাকরি করার শখ প্রথম থেকেই। ষাটের দশকে বিদেশ যাওয়া এতো সড়সড়ে ছিলো না। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে বিদেশ ছিলো স্বপ্নের সোনার হরিণ।

মুক্তিযুদ্ধের পরপরই অফিসের টুরে আমেরিকা গিয়ে গাড়ি একসিডেন্টে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো কোহেন। পরে ওর চাচা, আমেরিকাবাসী কাজেম সাহেবের চেষ্টায় সে থেকে যায় ওখানে। আর দেশে আসার নাম নেই। ক্রমে শেকড় গজালো বিদেশের মাটিতে। লাউরা এলো জীবনে। অভিবাসী হয়ে গেলো কোহেন। হারিয়ে গেলো তাদের বন্ধু বন্ধুত্ব দুটোই।

বেশ জমিয়ে গল্প চলছিলো। হঠাৎ দরজায় বেল বাজে। অবাক হয় মইন। এখন তো কারো আসার কথা নয়! মইন উঠে গিয়ে দরজা খোলে। উল্লাসে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, কোহেন এসেছিস?

সবাই তাকায় দরজার দিকে। খুশির ফোয়ারা বয়ে গেলো ঘরে। অবাক হয়ে শুভ দেখে কোহেনকে। মাঝ পিঠ বরাবর কাঁচা পাকা চুল ছড়ানো। চিরুনির সাথে সংস্রব নেই মনে হয়। সেই ঘনো কালো চুলের অর্ধেকও নেই মাথায়। বামকানে একটা ইয়ারিং ঝুলছে। চকচকে প্রাণবন্ত চেহারাটা বেশ মলিন। পাজামা পাঞ্জাবি পরলে কী ভালো দেখাতো আগে! বিষণ্নতায় ছাওয়া মুখমণ্ডল। এ যেনো অন্য কেউ! সেই কোহেন নয়!

চেয়ারে বসতে বসতে পকেট থেকে রাবারব্যান্ড বের করে ঝুটনি বাঁধলো খুব যত্ন করে। কয়েকটা চুল ছিঁড়ে গেলে 'আহা আহা' করে। বলে, বেচারা লাউরার চুল ছিঁড়ে গেলে খারাপ লাগে।

-মানেটা কী কোহেন ভাই? অনিতা এবং শীলা এক সাথেই প্রায় প্রশ্ন করে। উৎসুক চোখে তাকায় শুভ আর মইনও। মানে, তাদেরও প্রশ্ন এটা।

-ও হো, সব কথা তোরা জানিস না বন্ধু। আসলে জীবনের সত্য ঘটনা গল্পের চেয়েও চমকপ্রদ! জানি, বুঝি, আমার কষ্ট হবে মনে করেই তোরা লাউরার কথা কিছু জানতে চাস না। এক বছর হয়ে গেলো আজ ৬ই মার্চ। বেঁচে আছি। প্রথমে বলেছিলাম, পার্টিতে আসতে পারবো না। ভেবেছিলাম, ঘরেই থাকবো। পিকু আপু বাইরে গেলেন। কেমন খালি খালি লাগতে লাগলো। কেমন একটা একাকীত্ব! এই তারিখেই ঘটেছিলো ঘটনাটা। কাউকে কিছু বলতে পারি না। মনে জোর এনে তৈরি হলাম। আজই ভালো দিন। লাউরার কথাগুলো তোদের শেয়ার করার। ওকেও স্মরণ করা হবে। শেষের বাক্য উচ্চারণের সময় গলাটা ভার হয়ে এলো কোহেনের।

বিষণ্নতায় থম থম করে উঠলো ঘর। কেউ কোনো কথা বলতে পারছে না।

নাতনির গল্প থামিয়ে শীলা তাকালো অনিতার মুখের দিকে। মইন আর শুভ সরাসরি তাকালো কোহেনের দিকে। লাউরার কথা শুনতে চায় তারাও। কিন্তু সর্বনাশা ব্যথার গনগনে অঙ্গারে হাত দিতে পারেনি কেউ। ফোনেও জানতে চায়নি মইন বা শুভ। আসলে গাঢ় কষ্টের কথা বলার হয়তো একটা ক্ষণ লাগে। ভাষার যোগান লাগে। শুরু করার শক্তি লাগে। তখন ফেটে পড়ে আগুনের উদ্গীরণ। যেমন মাটি ফেটে সহ্যের শেষ মুহূর্তে বের হয় লাভা। আজ হয়তো কোহেনের সেই ক্ষণ।

-শেষ কয়টা মাস লাউরাকে নিয়ে হসপিসে ছিলাম। ওটা হলো মৃত্যুর প্রতীক্ষায় থাকার জায়গা। যাদের ভালো হয়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই, তাদেরকে এখানে রাখা হয়। নগেন দাসদের তুলসি তলা আর কি। কোহেন থামে।

অন্যেরা থেমেই আছে। বোবা হয়ে গেছে সবাই।

-শেষের কেমোগুলো দেয়ার পর লাউরার নজর কাড়া ঢেউ খেলানো সোনালি চুল কয়েকদিনের মধ্যে সব পড়ে গেলো। আরও ফ্যাকাসে দেখাতে লাগলো লাউরাকে। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করতো কখনও আমার। আহা, কেশ বিন্যাশে ফ্যাসন বিলাসী লাউরা, বেল মাথা হয়ে গেছে।

মৃত্যুর স্তব্ধতা ঘরে। কোহেনের কথা শোনার জন্য চারজনের সারা শরীরটাই কান হয়ে উঠেছে। টান টান হয়ে আছে স্নায়ু।

-সময়গুলো খুব কষ্টের ছিলো রে। শেষ দিকে ও খুব আমার সঙ্গ চাইতো। ছুটি নিয়েছিলাম। বিছানার পাশে চেয়ার নিয়ে লাউরার হাত ধরে বসে থাকতাম। কখনও বিছানায় বসলে আমার কাঁধে মাথা দিয়ে অস্ফুটে কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়তো। ভয়ে ভয়ে আলতো করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতাম। মস্ত বড়ো অপারেশন হয়েছিল মাথায়। বেচারা! এতো যে নিয়ম কানুন মেনে চলতো, ইয়োগা করতো, তার আবার ক্যান্সার হবে, এটা ভাবিনি আমি কখনও। আসলে মানুষ কতোটুকু ভবিষ্যৎ ভাবতে পারে!

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। হারিয়ে গেছে সবার কথা।

-চুল উঠেছিলো পরে? শীলা জানতে চায় সাহস করে।

-দু চারটে। হাত দিয়ে দেখতো লাউরা। আয়নায় মুখ দেখতো না। আমাকে একদিন বললো, আমি চাই তুমি আমাকে বিয়ে করো। আর কোনো হোম থেকে একটা নবজাতক এনে আমার কোলে দিও। কেমন বৌ বৌ এবং মা মা লাগে দেখতে, তার ছবি তুলে রেখো।

চোখ দুটো জ্বালা করে ওঠে মইনের। যে মেয়ে বাচ্চা নেয়নি, বিয়ে করেনি, সে এখন বিয়ে করতে চাইলো। বাচ্চা কোলে নিতে চাইলো। সখটা তাহলে ছিলো!

অনিতা দেখে, মুখ ঘুরিয়ে শীলা চোখ মুছছে। কান্না কখনও কখনও সংক্রামক হয়ে ওঠে। অনিতার অশ্রুও বাধা মানলো না।

ধ্যান মগ্নের মতো কোহেন কথা বলে যাচ্ছে আপন মনে। ব্যথার উদ্গীরণ হলে বোধ হয় ওর কষ্টটা কিছু কমবে। সবাই শুনছে কোহেনের কথা, একদিন চার্চের পাদ্রি ডেকে বিয়ে করলাম। অনেক কষ্টে লাউরা উঠে বসলো। ফুল দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলাম বাসর শয্যা। লাউরার বোন ফুল দিয়ে সাজালো ওকে। কে বলবে মাথায় চুল নেই? সেই অসামান্য চিকুর রাশি অদৃশ্য! ফুলের মুকুটে লাউরাকে সেই আগের মতো সুন্দর লাগছিলো। পাদ্রির সাথে সমস্ত শপথ উচ্চারণ করলাম আমরা। বললাম,

সারাজীবন দুজন দুজনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবো। ইত্যাদি ইত্যাদি...। যদিও জানি, সারাজীবন মানে আর কয়েক সপ্তা। তাতে কি? বিয়ে তো বিয়েই। দশ পাউন্ডের একটা ওয়েডিং কেক কাটা হলো। দুজন দুজনকে খাওয়ালাম। কী মিষ্টি করে হাসলো লাউরা।

একটু থামে কোহেন। কয়েকটা নিঃশ্বাস টানে এবং ছাড়ে। শীলা এবং অনিতার টিসু পেপার ভিজে গেছে।

-লাউরার কিছু সম্পত্তি ছিলো। সেগুলো যেনো নিরংকুশভাবে আমি পাই, সেজন্যেই বিয়ে করেছিলো লাউরা। ওদেশের আইনে, বিবাহিত দম্পতির মর্যাদা উচ্চে। একজন মারা গেলে অন্যজন তার সব কিছুর মালিক। লিভ টুগেদার করলে কেউ কারো সম্পত্তি পাবে না। যদি না উইল করে রাখে। বিয়ের দুইসপ্তা পরে পরিচিতের মধ্যেই নবজাতক পাওয়া গেলো। কিন্তু কোলে নেয়ার শক্তি ছিলো না লাউরার। তবু পাশে শুইয়ে ছবি তুলে দিলাম মোবাইলে।

ছবিগুলো বার বার দেখতো আর হাসতো। দিন ফুরিয়ে আসছে বুঝতে পেরেছিলো লাউরা। একদিন বললো, আমার তো চুল নেই। তুমি আর চুল কেটো না। মনে করো, আমার চুল তোমার মাথায় গিয়ে বড়ো হচ্ছে। আহা, কী দারুণ স্বপ্নবাজ মেয়ে ছিলো, না? সেই থেকে চুল কাটিনি। সত্যি বিশ্বাস করি, লাউরার চুল আমার মাথায় বড়ো হচ্ছে। তবে ওর মতো মসৃণ চিকুর রাশি হয়ে নয়, নিতান্তই আমার কর্কশ চুল হয়ে। আবার চুপ সে।

-কি হলো! খেতে দিবি না কিছু? গল্প তো খতম। স্বপ্নের ঘোর থেকে কোহেন ফিরে আসে বাস্তবে।

সচকিত হয় অনিতা। তাইতো, কারো প্লেটেই কিছু নেই। তাড়াতাড়ি সকলের প্লেটে খাবার তুলে দেয়। ঘরে বানানো চিকেন প্যাটিস, মিট বল, পরাটা, নানরুটি, খেজুর গুড়ের পায়েস, পুডিং, সব অপেক্ষায় আছে।

শুভর মনে হলো, কাউকে সদ্য কবর দিয়ে এসে ব্যথা ভারাতুর মনেই বসে গেছে ভুঁড়ি ভোজে। এইতো মানুষের জীবন! গল্প তো নয়, যেনো শর্ট ফিল্ম দেখছিলো। এমন দিল-তোড় ভালোবাসাকে নিজের হাতে মাটির নিচে রেখে এসেও মানুষ বাঁচে! কাটাবে কি করে বাকি জীবন কোহেন? মনের ভেতর দুমড়ে মুচড়ে ওঠে শুভর।

কোহেন বারবার হাতঘড়ি দেখছে। মইন প্রশ্ন করে, কোথাও যেতে হবে?

-না। সেই আসবে। কোহেন বলে।

-কে, কে আসবে? বলিসনিতো? মইন প্রশ্ন করে।

-প্রমীলা। আমার বাকদত্তা। কুহু আপার ননদ। আমার লম্বা চুলের গল্পটা সে জানে। এক দিনেই ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলাম। আমার শূন্য ঘরে আসতে চেয়েছে। ও নিজেই আসবে তোদের দাওয়াত দিতে। মনে আছে তো প্রমীলাকে?

-আমাদের ব্যাচমেট ছিলো একজন প্রমীলা, মইন বলে।

-সেই, সেই প্রমীলা। কোহেন বলে, আমার এই অযত্ন চর্চিত চুল অনেকদিন পর প্রমীলা শ্যাম্পু দিয়ে পরিষ্কার করে দিলো। কি আরাম লাগলো! ভারি মিষ্টি মেয়ে রে!

-সেই প্রমীলা? ওকে মেয়ে বলছিস? শুভ অবাক হয়।

কোহেন বোঝে, ওঁরা প্রমীলার বয়সের কথা মিন করছে। তা বয়স তো হয়েছেই। তারা সমবয়সী সবাই।

-বয়স কিছু নয় রে, প্রাণটাই আসল। হাসে কোহেন। বলে, কাম অন, টোস্ট করি। জীবন থেকে আনন্দ বাদ দিতে নেই ফ্রেন্ডস। কাম অন। চিয়ার্স!

দ্বিতীয় মাতৃত্ব

সকলের ধারণা, নানু দাদু হলে জীবন ফুরিয়ে যায়। আশা আকাঙ্খা সুখ দুঃখ চাওয়া পাওয়া প্রেম ভালোবাসা ইত্যাদি মানবিক ও সুকুমারবৃত্তিগুলো মরে যায়। থাকে শুধু রাগ হিংসে কুচুটেপনা আর রাজ্যের রোগ। এই ধারণাটা যে কতো বড়ো ভুল, তা নিয়েই কথা হচ্ছিলো সেদিন। ওশিন এসব নিয়ে কোনো কথা বলছে না দেখে রাবেয়া বললো, তুমি একেবারেই চুপ কেনো ভাই?

-কি যে বলি, তাই তো ভেবে পাচ্ছি না।

-এখনই যদি কথা না বলো তাহলে আমরা সবাই যখন একসঙ্গে বসবো, তখন মুখই খুলবে না মনে হয়।

-আসলে কি জানো, আমার না আজকাল কথা বলতে ভালো লাগে না।

-জানি তো, নাতির কথা ভাবছো। এই নাতি প্রীতির জন্যই তোমাকে ওশিন ডাকি জানো তো?

মিষ্টি করে হাসে ওশিন। বলে, তোমার দেয়া এই নাম আমার ভালোই লাগে আপা।

আরে বাবা, ওরা কক্সবাজারে গেছে, ভালোই আছে। এতো ভাবনার কি হলো? সারাদিন শুধু নাতি আর নাতি। হাসে রাবেয়া।

-ভাবনা তো একটু হয় ভাই। অপুটা যে সাঁতার জানে না গো।

-তো কি হলো? বৌ আছে না, সামলে নেবে।

-তার তো শরীর ভালো না। আমি বলেছিলাম, এই সময় না যেতে। মাত্র চার মাস হলো, আর এক মাস বিশ্রামে থাকলে ভালো হতো। প্রথম বাচ্চা তো।

-তোমার না একটু বেশি বেশি ওশিন। দেখা শোনার জন্য তাহলে সঙ্গে গেলেই পারতে। আসল কথা হলো অপুর জন্য চিন্তা। এবার ওকে সাঁতার শিখতে বলো। এশা বলে।

ওশিন মুখ টিপে হাসে। মনে মনে বলে, যেতে চাইলেই কি যাওয়া যায়? পারলে তো যেতোই।

রাবেয়া বলে, এই প্রসঙ্গ বাদ দাও। আজ দই বড়া করেছি, একটু খেয়ে দেখো তো কেমন হলো।

-আপনার দই বড়ার তুলনা নেই আপা। ওশিন বলে, রেসিপি নিলেই কি রান্না হয়? হাতের গুণ লাগে।

-ঠিক বলেছো। আমার কাজের মেয়েটা দইবড়া বানায়। নরমও হয়। কিন্তু স্বাদ পাই না। এশা আপার বড়ার মতো হয় না।

-আজকাল ডাল বেটেই বড়া বানায়। একটু বেকিং পাউডার দেয়। তাতে ফুলে ওঠে বটে, কিন্তু স্বাদ হয় না। বাটা ডাল দুঘণ্টা রেখে দিয়ে খুব ভালো করে ফেঁটে নিলে বড়া ফোলেও, একটু টক টক স্বাদও হয়। অতো ধৈর্য কোথায় মানুষের আজকাল?

ভালোই কাটলো সময়। বাসায় ফিরে যে কে সেই। নিঝুম একেকীত্ব। ওশিনের বড্ড একা একা লাগে। সাতটা দিন কেমন করে এতো লম্বা হয়? অপুর মা বাবা দুজনেই মারা গেলো কুমিল্লা থেকে ঢাকায় আসার সময় বাস এক্সিডেন্টে। বাচ্চাটা আহত হয়েও বেঁচে ছিলো। কী মারাত্মক খারাপ সময় তার তখন। ঐ সময় আহত বাচ্চাটা নিতে এলো অপুর চাচা আর দাদি। ভালোবেসে নয়, অধিকার ফলানোর জন্য। এতো নিষ্ঠুর কি করে হয় মানুষ? অপু তখন মাত্র দেড় বছরের। বড়ো বাচ্চাটার বয়স মাত্র সাত। ওকে দিতেই হলো বুকে পাথর বেঁধে। কিন্তু অপুকে দিলো না। মায়ের স্নেহে বুকে তুলে নিলো। নাতির স্পর্শে ভুলে থাকতে চাইলো মেয়ের শোক। বড়ো নাতিকে কাছে না পাওয়ার শূন্যতা। শক্ত অবস্থান নিলো ওশিন। প্রয়োজনে মামলা মোকদ্দমা করবে। কিন্তু অপুকে দেবে না, স্পষ্ট জানিয়ে দিলো।

কোনোদিন অপুকে যেতে দেয়নি দাদার বাড়ি। ওরাও খুব কম খোঁজ খবর নিতো। টাকা পয়সা দেয়নি কখনো। তাতেই বেঁচেছে ওশিন। দাবি করতে এলে অন্তত সেই কথাটা বলতে পারবে। আর অপু তো চেনেইনি দাদা বাড়ির কাউকে। ওশিনের স্বামী ইসমাইল জাহাজে কাজ করতো। দুনিয়ার অনেক কিছু দেখেছে। বিবেচক মানুষ। তাঁর ধারণা ছিলো, বেশি ছেলে-মেয়ে হলে ভালোভাবে মানুষ করা যাবে না। পরিবার পরিকল্পনার কথা সে অনেক আগেই জেনেছে দেশ-বিদেশে জাহাজে ঘোরার সময়। ওশিনকেও বলেছিলো। সংসার বড়ো করবে না এই চিন্তা থেকেই ঐ একটি মাত্র মেয়েই নিয়েছিলো তারা। নাম রেখেছিলো রঞ্জনা। চমৎকারভাবে মানুষও করেছিলো। ধুম ধাম করে বিয়ে দিলো। দশ বছরের সংসার জীবনে খুব ভালো ছিলো তারা। কিন্তু কপালে সইলো না। এখনো ভাবতে পারে না ওশিন পেছনের কথা। বুক ফেটে যায়। কিন্তু আয়ু না ছাড়লে তো যেতেও পারবে না ওপারে।

প্রথম প্রথম অপু 'মা' বলে ডাকতো ওশিনকে। কাজের বুয়ার ডাক শুনে শিখেছিলো। জান জুড়িয়ে যেতো ওশিনের। সে তাকে ডাকতো ‘দিদাম’ বলে। এক সময় সেও তাকে পাল্টা ‘দিদাম’ বলতে শিখলো। ভালোই হলো। শেখাতে হলো না। শব্দটা বলতে শিখে সারাদিন সে কি ডাকা ডাকি! দিদাম এটা দাও, দিদাম ওটা দাও, দিদাম মাছ বেছে দাও, দিদাম তোমার মুখের পান দাও, দিদাম তোমার চায়ের শেষটা দাও। আর ইসমাইল ওকে ডাকতো 'দাদা' বলে। পাল্টা অপুও বলতো 'দাদা'। ফলে নানা নানু শব্দ দুটো ও জানতোই না অনেক দিন।

শোক দুঃখ তাপ যাতনা বেদনার মধ্যেই অপু বড়ো হতে লাগলো। দিদাম আর দাদার চোখের মনি অপু। ওর এইচএসসি পরীক্ষার পর জীবনে দুর্যোগ আসতে লাগলো একের পর এক। ওর দাদার কিছু শেয়ার ছিলো এক ব্যাংকে। সে ব্যাংক দেউলিয়া ঘোষণা করলো। এক বন্ধু ট্রান্সপোর্ট-এর ব্যবসা করার জন্য টাকা নিয়েছিলো, সেটাও গেলো। ফেরি ঘাটে পন্টুন ছাড়িয়ে যমুনায় পড়ে গেলো বাসটা। দেশের জমি চাচাতো ভাইরা দখল করে আখ চাষ করতে লাগলো। যে আত্মীয় জমি দেখা শোনা করতো, সে দুদিনের জ্বরে মারা গেলো। যেনো মড়ক লাগলো সংসারে।

ইসমাইল কিছু বলতো না মুখ ফুটে। বুক চাপা মানুষ। কিন্তু এতো কি আর সহ্য হয়? চলে গেলো এক আঘাতেই। বললো, বুকে ব্যথা করছে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে ওরা বললো, সে আর নেই। ব্যস সব শেষ।

জীবনের পর্যটন চুকে গেলো বিনা নোটিসেই। তবুও জীবন। অপুকে যে মানুষ করতেই হবে। জীবনের ঘোর অমানিশার মধ্যে অপুই তার চন্দ্র-সূর্য। ওঠে ডোবে। প্রকৃতিতে শীত বসন্ত আসে। নির্বিকার সময়ের রথ ঘোরে আপন মনে। গোপনে চোখের কোণ মুছে ওশিন রাঁধে বাড়ে, খায়, খাওয়ায়। অপু বড়ো হচ্ছে এই তার সান্ত্বনা। রঞ্জনার একমাত্র বংশ প্রদীপ। তার সোনার পুতুল। প্রাণের প্রাণ। হৃদয়ের স্পন্দন।

দিন কেটে যায়। অপু বড়ো হলো। চাকরি পেলো। এক সময় মেয়ে পছন্দ করে তার বিয়েও দিলো। রঞ্জনা বলতো, সে মা বাবার মতো একটা মাত্র বাচ্চা নেবে না, নাতি নাতনিও হবে পাঁচ ছয়টা। মায়ের গল্প শুনে অপু হাসতো। কী যে সরল হাসি! এখনও দিদামের গলা ধরে শুতে ভালোবাসে। বিয়ের পর বৌ দেখে তো থ।

অপুর প্রথম চাকরি হলো পঞ্চগড়। 'যেতে নাহি দেবো' বললে কি আর হয়? নতুন বৌ নিয়ে অপু চলে গেলো একদিন চাকরিতে। ওশিনের মনে হলো হৃদয়টা খুলে নিয়ে গেলো অপু। তখন রোজ একবার করে ফোনে কথা বলতো। নাতিবৌ নাকি হাসতো দেখে। বলতো, এমন কখনো দেখিনি। রোজ কথা বলার কী আছে? সেই তো একই কথা, কী করছো, কী খেয়েছো, কোথাও বেড়াতে গেলে কিনা, এই তো। অপুই বলেছে বৌ-এর এসব কথা। তাই তো, এলেবেলে কথার যে কী মানে! যে না বোঝে তাকে বোঝানো যাবে না। আসলে গলার স্বরটা শোনাই উদ্দেশ্য।

আস্তে আস্তে অপুর ফোন করা কমে গেলো। বুকের ভেতর সে কি উথাল-পাথাল আউলা ঢেউ ওশিনের। কাকে বলবে কষ্টের কথা? সে নিজেই তো এখন এতিমস্য এতিম। কোথাও কেউ নেই যে তার কথা শুনবে এবং বুঝবে। একদিন অপুকে ফোনে বললো, দিদাম বাবা, খুব কী কাজ?

-তা কাজ তো থাকেই দিদাম।

-দু মিনিট সময় বের করতে পারো না সোনা? তোমার গলার স্বর না শুনলে যে আমার খুব কষ্ট হয় দিদাম। মন খারাপ করে।

-মন খারাপ করো না দিদাম। আসলে পরিস্থিতি মানুষকে বদলে দেয়। চাকরি সংসার এই সব ঝামেলায় থাকতে হয়। ভুলে যাই ফোন করতে।

মনে হলো, দূর থেকে ছোঁড়া চোখা একটা বল্লম ওশিনের বুকের ভেতর দিয়ে ঢুকে পিঠ দিয়ে বের হয়ে গেলো। বুঝে নিলো অনেক কিছু। বললো, ভালো থেকো তোমরা। দোয়া করি।

-তুমি কেমন আছো বলো? কী হলো দিদাম, হাসছো যে?

-এমনি। ভালো আছি।

-তোমার পায়ের ব্যথা?

আবার হাসি। বলি, ব্যস্ত হয়ো না। মানুষ পরিস্থিতির দাস। শরীরের নাম মহাশয়। সব ঠিক আছে।

আসলে কিছুই ঠিক নেই ওশিনের। ঠিক মতো রান্না করে না। সময় মতো খায় না। ভালোই লাগে না কিছু। বলেছিলো সবাই, কষ্ট পাবি রে ওশিন, এতো ভালোবাসিস না। বলেনি শুধু তার মানুষটা। সে জানতো, অপু ছাড়া ওশিন বাঁচতো না। সারা পৃথিবী ভুলে থাকে সে অপুকে নিয়ে। একমাত্র সন্তানকে ভালোবেসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার আগেই সে চলে গেছে। হৃদয় পাত্রে এখনো অমিয়ধারার সরোবর। বাতসল্যের গভীর সাগর। অপুর সেখানে নিত্য অবগাহন। এর কী হিসাব নিকেশ হয়?

ওশিনও ভাবে, বেশি ভালোবাসলে যদি কষ্ট পেতে হয়, তো হবে। হায়রে, ভালোবাসা কি হিসেবের জিনিস? তাকে অঙ্কে বাঁধতে গেলে উত্তর মেলে না। ধরতে গেলে পালিয়ে যায়। না চাইলে গায়ে এসে গলে পড়ে। তাকে দিতে চাও, নেবে। ভালোবাসা তো খাদক। যতো দেয়া যাবে ততোই খাবে। বেহিসেবে টইটম্বুর। কে কবে তার হিসেব মেলাতে পেরেছে? ওশিন সামান্য নারী। নাতিকে ভালোবেসে আনন্দ পেয়েছে, ভালোবেসে গেছে এতিম নাতিটাকে। কষ্ট পেলে কিছু করার নেই। জেনে শুনেই তো বিষ পান করেছে সে। এক এক সময় মনে হয়, এই মায়া মমতা ভালোবাসার মতো বিষ আর কিছু নেই এই পৃথিবীতে। তবু মানুষ এই বিষের নেশা করে। এই এক নেশায় সারা জগত কাবু।

হায়রে, নানু দাদু হলেই যদি জীবন শেষ হয়ে যেতো, তাহলে নাতি নাতনিকে বুকে আগলে রাখার মানুষ পাওয়া যেতো না সংসারে।

এইতো কক্সবাজারে গেছে আজ পাঁচ দিন। একবারও ফোন করেনি। যাক, ওরা ভালো থাক। জানে তো না যে পুতি-পুতিনের মুখ দেখতে পাবে কি

না? এখন কি আর অপুর বাচ্চাকে যত্ন নিতে পারবে? যেমন করে নিয়েছে অপুর? দৈনিক অপুকে পড়াতে বসে কতো গল্প শোনাতে হতো। ওর এখন আটাশ বছর বয়স। এইচএসসি পর্যন্ত গড়ে প্রতিদিন কম করে হলে তিন চার ঘণ্টা ওর জন্য রাখতেই হতো। কী আনন্দের বিনিয়োগ ছিলো সেটা।

ছোটো বেলায় কখনও বায়না তুলতো, কোলে বসে পড়বে। তাই সই। নরম তুলতুলে ছোটো রঞ্জনার মতো লাগতো। বুকের মধ্যে কী আশ্চর্য এক কোমল অনুভব যেনো নড়ে চড়ে বেড়াতো। সে কি সুখ? সে কি ভালোবাসা? সে কি আঁকড়ে রাখার অব্যক্ত আকুলতা? সে কি রক্তের গান? সে কি নিরন্তর পাওয়ার ইচ্ছে? না কি আরো উজাড় করে দেয়ার ইচ্ছে? না কি প্রগাঢ় অপত্য স্নেহের অতৃপ্তি? না, ভালোবেসে সাধ না মেটার অসীম অক্ষমতা? কিছুতেই বুঝতে পারতো না সে। সুখে আনন্দে উতল হয়ে থাকতো মন।

একবার দেশের বাইরে গিয়েছিলো ওশিন প্রায় মাস খানেকের জন্য। অপুর বয়স তখন সাড়ে তিন। বাসায় শাশুড়ি ছিলেন। দেখে শুনেই রেখেছিলেন। কিন্তু ওশিন ফিরে আসার পর ওর সে কী কান্না! সে কান্নার ভাষা একটাই, ও... দিদা...ম, ও... দি...দা...ম। ওশিন বুকে জড়িয়ে নেয়ার পরও তার কান্না থামে না। অপুও কাঁদে, ওশিনও কাঁদে। ছোট্ট বুকে এতো কষ্ট হয়েছে ওর! আহারে জান, আহারে যাদু, মানিক আমার, এই তো আমি তোমার কাছে। তুমি আমার কোলেই আছো তো। কতো কথা বলে ওশিন, তবু ওর কান্না থামেই না। আজো মনে হলে বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। মনে মনে বলে, বাছা আমার ভালো থাকো। সব সময় ভালো থাকো। সুখি হও। বড়ো হও। অনেক বড়ো হও। সুস্থ দীর্ঘ জীবন পাও।

মনে আছে কাল 'নানু দাদু' সংস্থার মিটিং আছে। কিছু খাবার বানিয়ে নিয়ে যেতে হবে। রসমালাই আর কিমা সামুসা করে রাখলো ওশিন। মিটিং-এ যাওয়ার আগে সামুসা ভেজে নেবে। কাজগুলো গুছাতে বেশ রাত হলো। একটা প্লাসটিকের কন্টেইনারে অপুর জন্য রসমালাই তুলে ফ্রিজে রাখে ওশিন। দুদিন পরেই তো আসবে। যা পছন্দ করে এই মিষ্টিটা অপু। খুশিতে বাগ বাগ হয়ে যাবে। দৃশ্যটা কল্পনা করতেও সুখাবেশ আসে।

এবার ঘুমোনো দরকার। কিন্তু ঘুম যে আসছে না। ওশিন বিড় বিড় করে বলে, ওগো দয়াময়, কাল যেনো অপুর একটা ফোন পাই। আহা, এমন অবাধ্য মন কেন দিলে বিধি? এই মন নিয়ে কি করি, তুমিই বলে দাও।

অপুরে, তোকে শুধু পেটেই ধরিনি। মাতৃত্বের সবটুকু উজাড় করে দিয়ে কি অপরিসীম আদরে ভালোবাসায় বড়ো করে তুলেছি, সেটা ঐ ওপরওয়ালা জানেন। নানা চিন্তায় ঘুমটা যে কোথায় পালালো! কিছুতেই চোখের পাতায় আসে না।

একা বাড়ি। সঙ্গী বলতে টেপি বুয়া। তবে একা থাকতে আজকাল তার বেশ ভালো লাগে। নিজের মধ্যে যে আত্মসরোবর আছে,সেখানে ডুব দিয়ে দেখা যায় অনেক কিছু। নাড়া চাড়া করা যায় সুখ দুঃখের কতো শতো ঘটনা। আসলে জীবন তো হয় পেছনে, নয় সামনে। বর্তমানটা শুধুই সময়যান। তার রথে চড়ে মানুষ এগোয়। পেছনে যেতে হলে চাই নীরবতা। নির্জনতা। আঁধার গুহার স্তব্ধতার মতো মগ্নতা। শুধুই নিজেকে দেখার সুযোগ তখন।

শরীরে কেমন এক অস্থিরতা লাগছে ওশিনের। আহা, কেউ এক গ্লাস পানি ঢেলে দিলে ভালো হতো। মনে হয় পেটে গ্যাস হয়েছে। বুকে একটু ব্যথাও করছে। টেপি তো ঘুমোচ্ছে অঘোরে। বিছানা ছেড়ে উঠতেও পারছে না ওশিন। কেমন এক অসাড়তা সারা শরীর জুড়ে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ব্যথাটা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়লো সারা বুকে। কী মারাত্মক যন্ত্রণা! কী হলো তার? কী করবে এখন ওশিন? টেপি বুয়াকে ডাকবে কি? আহ! আর সহ্য হয় না। আল্লাহ রাসুলের নাম মনে এলো না, কালেমা পড়ার কথাও নয়। বুকের ভেতর থেকে নিখাঁদ বাতসল্য আর গভীর ভালোবাসা মথিত একটা বাক্যই শুধু বলতে পারলো ওশিন, ওরে আমার অপু দিদাম! কাছে আয় রে!

মিটিং-এ বসে আয়েশা উস খুস করে। এলো না কেন ওশিন? বেলা বারোটা বেজে গেলো। এখানে লাঞ্চ করার কথা। তার খাবার আনার কথা। এমন তো করে না ওশিন!

অন্য সদস্যরা এসে গেছে। দুশ্চিন্তায় পড়ে আয়েশা। অবশেষে ফোন করে আয়েশা। ওশিনের ফোন বাজে, কিন্তু কেউ ধরে না।

রাবেয়াও ফোন করে দুবার। সুন্দর রিং হয়। কিন্তু কেউ ধরে না। হলোটা কি ওশিনের?

উদ্বিগ্ন হয় অন্যেরাও। এই বয়সে একেবারেই একা থাকে বলতে গেলে। টেপি বুয়াকে ঠিক পুরো মানুষ বলা যায় না। ফোনটা পর্যন্ত ধরতে পারে না। একটা ফোন তো করতে পারতো ওশিন!

এমন পরিস্থিতিতে কি আর মিটিং হয়? মূলতবী করা হলো মিটিং। খাবারগুলো তো আর ফেলে দেয়া যায় না। সেগুলো খেয়ে নিতে হবে।

এশা আর রাবেয়াসহ 'নানু দাদু' সংস্থার আরো তিনজন মিটিং শেষে ওশিনের বাড়িতে যাবে ঠিক করলো। অন্য সদস্যরা টেবিলে খাবার পরিবেশন করছে। সুখাদ্য সুপাচ্য সুদর্শন খাবারের গন্ধে ম ম করছে সারা ঘর। সুগন্ধে সুবাতাসে খিদে তীব্র হয়ে উঠেছে সবার।

হঠাৎ এশার হাত থেকে সালাদের বাটিটা পড়ে ভেঙে গেলো। কেমন বিকট একটা শব্দে আঁতকে উঠলো সবাই।

এমন সময় বেল বাজলো। সকলেই উচ্ছসিত হয়ে বলে, যাক, ওশিন এলো এতোক্ষণে।

দরজা খোলে আয়েশা।

ওশিন কোথায়? আলুথালু বেশে টেপি বুয়া এসে উচ্ছ্বসিত কান্নার ভেঙে পড়লো।

শাখামৃগ বৃন্দ ও নালায়েক যুবকটা

হাঁসফাঁস করে উঠে বিছানায় বসে তমাল। শালা স্বপ্নের বাচ্চা। গুষ্টি বেচি তোর। আর কোনো টপিক পেলিনা দেখানোর! গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। সাইড টেবিলে রাখা বোতল মুখে ধরে পানি খেলো। তাড়াতাড়ি করার জন্যেই বোধ হয় নাক মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো কিছু পানি। গায়ে এসব জবরজং কি? টিসুর জন্যে হাত বাড়ালো। পেলো না। তাই তো, পড়ার টেবিলে রেখেছে। মানে বিছানা থেকে নেমে গিয়ে আনতে হবে। ধুর! তার চেয়ে ভালো লুঙ্গির খুঁট।

নাক চোখ মুছে তমাল আবার শুয়ে পড়ে। কিন্তু ঘুম পালিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে ঘরের ভেতর ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি আপদ! অবাক হয় তমাল। ভাবে, তার ঘরটাই এতো পছন্দ হতে হবে কেনো ওদের? তিন লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে, থুক্কু, উপহার দিয়ে ঢাকায় জয়েন করার ব্যবস্থা করেছে। উপহারের টাকা জোগাড় করতে গিয়ে গ্রামের সামান্য যা কিছু ছিলো, তা বিক্রি করতে হয়েছে সব। পুকুর , ভিটে, আম কাঁঠালের গাছ, মায় দুধেল গাইটা পর্যন্ত। ভিটের ওপর শোয়ার কুঁড়ে ঘরটা শুধু আছে। বাবা থাকেন। বড়ো দুই ভাই পাশের গ্রামে অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ঘরের মেয়ে বিয়ে করে সেখানেই ঘর বসত করে। তার এই ছোট্ট ঘরে সে তাদের চেয়ে ভালো আছে। কারণ, তার স্বপ্ন আছে। স্বপ্ন ছাড়া জীবনের মূল্য কি? ভাইদের স্বপ্ন নেই। সে সংগ্রাম করে উন্নত জীবনের জন্যে। ভাইয়েরা বলদের মতো খাটে, গ্রামের মাতব্বর হওয়ার জন্য। ওরা কৃষি খামারের মালিক হওয়ার কথা পর্যন্ত ভাবে না।

বৃত্তি পেয়ে পেয়ে পড়েছে তমাল। অংকের পণ্ডিত স্যার আর বাংলা ম্যাডামের উৎসাহ না পেলে তাকেও জমি জিরেত দেখে খেতে হতো। করপোরেট অফিসে চাকরিটাও স্যার এবং ম্যাডামের জন্যেই হয়েছে। তারপরেও উপহার দিতে হয়েছে। মনের ইচ্ছে, বছর দুয়েকের মধ্যে গ্রামের

পাট চুকিয়ে দিয়ে গাজীপুরে নিয়ে আসবে বাবাকে। তারপর বিয়ে, সংসার, ছেলেপুলে। বড়ো বাড়ি হবে। বাবার জন্যে কাজের লোক রেখে দেবে। ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া। বিদেশ পাঠানো। সময় তো পাখির মতো উড়ে যাচ্ছে। এক বছর কোথা দিয়ে গেছে বুঝতেই পারেনি।

আউ! আঁতকে ওঠে তমাল। আবার ওদের চলা ফেরার শব্দ। মনে হলো, লাফিয়ে পড়লো কেউ বিছানায়। একটা পাকা বাড়ির একটা রুমে সাবলেট থাকে। ঘর লাগোয়া ছোট্ট বারান্দার কোণায় চাল ডাল ফুটিয়ে নেয়। ভালোর মধ্যে একটা এটাচড বাথরুম আছে। যদিও চিপা, তবু স্বাধীনতা আছে। ঘুম তো গেছেই, বাথরুমে যেতেও ভয় করছে। রীতিমতো ঘামছে তমাল।

কিন্তু এ কি! এটা তো তার ঘর মনে হচ্ছে না। তার পাড়াতুতো চাচার সাথে একদিন পুরান ঢাকার দৈনিক এক পত্রিকার অফিসে গিয়েছিলো। মনে হচ্ছে সেই রকম মিটিং ঘর। ভালো করে তাকিয়ে দেখে, দেয়াল সরে সরে বড়ো হচ্ছে ঘরটা। শাখা মৃগরা তো প্রথম থেকেই ছিলো। এখন মানুষেরাও এসে বসছে। ডেকোরেটদের সস্তা প্লাস্টিকের ছাই রঙা চেয়ার পাতা সারা ঘরে।

তমাল চিনতে চেষ্টা করে মানুষদেরকে। বিশাল ঢাকা নগরে এক বছরে কাউকেই চেনা হয়নি। বন্ধুত্ব হয়নি কারও সাথে। শুধু মুখ চেনা চিনি। দেখা হলে, 'হাই হ্যালো'। একটু হাসি। ব্যাস। তবু কিছু কিছু মানুষকে চিনতে পারলো। প্রায় রোজই পত্রিকায় ছবি আসে ওদের। ওঁরা কেউ কেউ পত্রিকার মালিক। কেউ মন্ত্রী। কেউ ব্যবসায়ী, কেউ সাংবাদিক, কেউ নেতা। বাকিরা কিছু পাতি নেতা, ছাতি নেতা, জুতো নেতা, ঝাঁটা নেতা, চাটা নেতাকেও দেখা গেলো। ওরে বাবা, তার ধনী বসকেও দেখা যাচ্ছে। অফিসের ফোন অপারেটর মিনুকেও দেখা যাচ্ছে বেশ সেজেগুজে এসেছে। বস আজকাল মিনুকে বেশ পছন্দ করছেন। ফিস ফাস হয় এই নিয়ে অফিসে।

টেবিল চাপড়ে কিছু ঘোষণা দিচ্ছে এক মস্ত স্বাস্থবান শাখা মৃগ। আরেব্বাহ! সে তো দিব্যি মানুষের ভাষায় কথা বলছে। স্বরটা একটু নেকো। সাজ পোশাক বনেদি মানুষের মতো। হাফ হাতা রাজশাহী সিল্কের সার্ট আর পায়জামার সাথে ঘাড়ে ঝোলানো একটা চাদর। পায়ে জরির হালকা কাজ করা চপ্পল। ডান হাতে পান্না বসানো রুপোর আংটি। ঢল ঢল করছে। খুলে না গেলে হয়! বেশ অভিজাত লাগছে।

- আমার প্রিয়জনেরা, আজ মিটিং ডেকেছি বিশেষ বিপদে পড়ে। আপনারা এসেছেন, ধন্যবাদ জানাই। কিছুদিন ধরে আমরা খেয়াল করছি, মানুষ অকারণে আমাদেরকে নির্যাতন করছে। কদিন আগে একটা এলাকায় বিষ প্রয়োগে আমাদের প্রায় পঞ্চাশজন সদস্যকে হত্যা করেছে তারা নির্মম ভাবে। সেটা আবার পত্রিকায় ফলাও করে ছাপানো হয়েছে। কি ধৃষ্টতা! তাদের মধ্যে আমার মেয়েটার নিরপরাধ জামাইও ছিলো। আহা বাছা! কতোই আর বয়স হবে! হঠাৎ দুই হাতে মুখ ঢেকে শব্দ করে কাঁদতে শুরু করে সর্দার শাখামৃগ।

দেখা দেখি অন্য অনেক শাখামৃগ দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলো। কি অবাক, মানুষেরাও কাঁদছে। তাদের কাঁদার কারণ কি? তমালের চোখে পানি নেই। কান্নাও আসছেনা।

পাশে থেকে এক শাখামৃগ গায়ে ধাক্কা দিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বললো, আপনি কাঁদছেন না কেনো?

-আমার কান্না আসছে না।

-না আসলেও দুই হাতে মুখ ঢেকে কান্নার ভান করেন।

-চোখে তো পানি আসবে না।

-নিকুচি করি সৎ মানুষের। চোখে অনেকেরই পানি নেই। তবু নেতাকে সঙ্গ দিচ্ছে। দেখছেন না?

-কান্নার আবার সঙ্গ দিতে হবে কেনো?

-এই চুপ, চুপ। কে যেনো হিস হিস করে বললো।

-ভাইসব, নেতার গলা শোনা গেলো আবার, সংক্ষিপ্ত সভায় বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ে শুধু কয়েকটা কথা বলার জন্যই এসেছি। মনে রাখতে হবে, আমরা মানুষ নই, শাখামৃগ। কর্নাটকে হাম্পির কিষ্কিন্ধার পূণ্য ভূমিতে আমাদের পুর্বপুরুষের বাস। পুন্যতোয়া তুঙ্গভদ্রানদীর লালনে চিরসবুজ দণ্ডকারণ্যের গল্প এখনও প্রজন্মের মুখে মুখে। বাগদাদি সৈয়দের যেমন আলাদা বংশ মর্যাদা আছে, কিষ্কিন্ধার আদি বাসিন্দা হিসেবে আমাদেরও আছে তেমনি বংশ মর্যাদা। বাপ দাদার কাছে শুনেছি, আমরা চিরবরেণ্য সুগ্রীবের বংশধর। আমরা মিছে কথা বলি না। ঘুষ খাই

না। পুকুর চুরি করি না। মিছে ডাক্তারি সার্টিফিকেট দিই না। করোনার মতো ঘাতক রোগ নিয়ে ব্যবসা করি না। পরের দেশে টাকা পাচার করি না। আমাদের সমাজে ধর্ষণ নেই। মানুষ আমাদের একটাই দোষ ধরে, আমরা ফ্রি সেক্সে বিশ্বাস করি। কিন্তু মানুষেরাও কম যায় না। ওরা বলে না, আমরা বলি। ওরা ফ্রি সেক্সের অভাবে পরকীয়া নিয়ে খুনোখুনি করে। আমরা করি না। আমরা আপোসে বিশ্বাসী। যাক সে কথা।

বিচিত্র ধ্বনিতে হাসির রোল শোনা গেলো। বয়সি শাখা মৃগীরা শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললো লজ্জায়। অল্প বয়সি পুরুষ মহিলা শাখামৃগ মৃগীরা তাদের টাইট ছেঁড়া ফাঁটা জিন্সের প্যান্টের দিকে তাকিয়ে খুশি হয়ে গেলো। সরু সরু লাঠির মতো পা হওয়ার জন্য কারও কারও পা বের হয়ে গেছে ছেঁড়া জায়গা দিয়ে। বেচারারা, মানুষের মতো করে ছেঁড়া ফাঁসা ফুটো কাটা জিন্সের প্যান্ট সামলাতে পারে না এখনও। তবু নিজেরা নিজেরাই টেনে টুনে ঠিক করে নিলো স্মার্ট যারা। শাখামৃগীরা কেউ ওড়না পরে না। বুকের মাপের চেয়ে ছোটো কাপের ব্রা পরেছে সিনেমার সেক্সি নর্তকিদের মতো। সেগুলো দেখে নিলো একবার।

নেতা বলে যাচ্ছেন, তবে খাওয়া দাওয়াটা জোটাতে হয় এখান ওখান থেকে। বনে জঙ্গলে বিধাতা আমাদের জন্য প্রচুর খাবার দিয়ে রেখেছেন। তবু কিছু দুষ্টু ছেলেমেয়ে মাঝে মাঝে মানুষের ঘরে ঢুকে কিছু খাবার নিয়ে আসে। কি আর এমন সেটা! এই রুটি বিস্কুট বাদাম কলা এই সব। সেই জন্য বিষ দিয়ে আমাদেরকে হত্যা করা হবে? কতো শিশু মা বাবা হারালো। এতিম বাচ্চাগুলোর কি হবে এখন?

আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে সর্দার। এবার হেঁচকি উঠে যায়।

হই চই করে কেঁদে ওঠে সভায় উপস্থিত সবাই। এবারেও তমাল কাঁদে না। পাশের শাখামৃগটা বললো, সমস্যা কোথায় আপনার? কাঁদছেন না কেনো এখনও?

-কিছু বুঝতে পারছি না।

-মানুষের বুদ্ধি যে আমাদের চেয়ে কম, সেটা জানি। কিন্তু আপনার মাথায় তো দেখি মুরগির মগজও নেই। শুরু করেন। কাঁদেন। দল করতেও শেখেননি?

-দল করে কি হবে?

-এখনও বোঝেননি? আসলে মুরগিও না আপনি। এতো দেখি কেঁচো প্রজাতির। বড়শিতে গেঁথে নেয়ার পরেও বুঝতে পারেন না যে, গেঁথে গেছেন। আরে ভাই, দল করলে গাছেরটা খেতে পারবেন, তলারটাও পারবেন।

-আমি দল করতে চাই না।

-এমন কথা তো আগে শুনিনি কোনও দিন। দলে ভেঁড়ার জন্য পাতিনেতাদের পায়ের জুতো পালিশ করে দেয় মানুষ, আর আপনি বলছেন দল করতে চান না।

- না, চাই না।
- কোন ভাগাড় থেকে এসেছেন জনাব?
- আমি ঢাকায় থাকি।
- কোন গুরু আপনাকে দল করতে না করেছে?
- সে জন্যে গুরু লাগে নাকি?
- বড়োই সেয়ানা দেখি। চটকানা খাননি তো!
- চটকানা খাব কেন?
- খিংটক পালোয়ান থাকলে এতোক্ষণি আপনার যোতা মুখ ভোতা করে দিতো।
- পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করছেন আপনি। জানেন আমি কে?
-কুখ্যাত ভাগাড়ের, অখ্যাত গাঁয়ের, কেঁচো পাড়ার, গুবরে পোকা আপনি।

এবার রেগে যায় তমাল। সত্যি কথাটা বলি তাহলে। আমার একজন রাশিয়া ফেরত কাকু আছেন। তিনি আমাকে 'না' করেছেন দল করতে। বলেছেন, সমাজতন্ত্রের মতো বিশাল দল, বিশাল আদর্শের ভান করেও টেকানো যায়নি দল। ভেঙে গেলো অতো বড়ো দেশ। আর আমাদের দল তো কোনো পদেরই না। কোনো আদর্শই নেই। ভেতরে ভেতরে শুধু কোন্দল। শুধু খাঁই খাঁই। কেন খাঁই, তাও জানে না।

-আপনার কাকু একটা আস্ত গাড়ল।

-কী যা তা বলেন! ঐতো নেতার পাশে বসে আছেন, ঐ যে মস্ত মোটা মতো, কাগজে ছবি দেখেন না রোজ রোজ, ওই মন্ত্রীই আমার সেই কাকু।

শাখামৃগটা নিজের হাতে দুই কান ধরে জিব কাটলো। বললো, থুককু ভাই। আমার কথাটা আপনার মন্ত্রী কাকুকে বলবেন না প্লিজ।

-ও কিছু না। অনেক খারাপ খারাপ গালি ওদের সহ্য করতে হয়। আমার সামনেই কতো লোকে অকথ্য গালি দেয়। মুখে মুখে জুতো পেটা করে। সাধে কি পরিচয় দিই না?

-এই যে, এতো ফিস ফাস কী? কান্না ফেলে কথা বলছেন কেন? বেজায় ক্যাটকেটে গলায় ধমকে ওঠে এক শাখামৃগি। ভাবসাব ব্যাজ দেখে মনে হয়, নেত্রী। অন্ততপক্ষে চাটা নেত্রীতো বটেই। বলে, এই যে মুখ ঢেকে কাঁদেন শীগগীর। না হলে মরিচ পানির স্প্রে আছে। স্বেচ্ছাসেবকেরা এসে দিয়ে যাবে চোখে। নেতার হুকুম আছে, সবাইকে চোখের পানি ফেলতে হবে।

-আপনারা জানেন, নেতা আবার বলা শুরু করেছে, সেই রাম রাজত্বের আমল থেকে আমরা মানুষের অনুগতো। আমরা মানুষদেরকে ভালোবাসি। রাক্ষস রাজা রাবনের সাথে যুদ্ধের সময় জীবনের মায়া ত্যাগ করে আমাদের পুর্বপুরুষেরা রামের পাশে পাশে থাকতো।

রাবনের পুত্র ইন্দ্রজিতের সাথে যুদ্ধে রাম লক্ষ্মণ যখন প্রায় মরো মরো, তখন আমাদের পুর্বপুরুষেরাই তাদের বাঁচিয়েছে। আহা! কতো শাখামৃগ শহিদ হয়েছে, তা লেখা আছে আমাদের শাখামৃগ 'কিঞ্চিত পুরানে'। কিষ্কিন্ধা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে সোনার কাসকেটে রাখা আছে সে গ্রন্থ। যে কেউ গিয়ে পড়তে পারে। একুশ শতকে শহিদ শাখামৃগদের স্মরণে একটা 'শহিদ মিনার' গড়া হয়েছে। আহা! কী তার শোভা! পর্যটক ভেঙে পড়ে প্রতি ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ তারিখে। ইতিহাস জানে, আমরা বিশ্বাসী। নিরিহ। ন্যায়পর প্রাণি। বিনয়ী। সে যাক। কিন্তু আজ কিছু কথা না বললেই নয়।

একমত প্রকাশের জন্য বিচিত্র প্রকার উল্লাসকর শব্দ শোনা গেলো।

নেতা দম নিয়ে বলেন, অনেক ভেবে দেখেছি, মনুষ্য সমাজের অধিকাংশ যদি অমানুষে ভরে যায়, তাহলে নরক হয়ে যায় পরিবেশ। সৃষ্টির সেরা জীবেরা যদি শেয়াল, কুকুর, বাঘ, সাপ, শকুন এবং কুমীরের মতো আচরণ করে, তাহলে আমাদেরও চরম ভুগতে হয়। ওরা শুধু টাকা চুরি করে, তাই নয়। আরও দশ জনকে চুরির ভাগ দিয়ে, কোটি কোটি টাকা পাচার করে

নিয়ে যায় পরের দেশে। ছি! ছি! এতটুকু দেশপ্রেম নেই। আমাদের কেউ এমন কাজ করেছে? কিষ্কিন্ধা আমাদের আপন ভূমি, বাপ দাদার স্পর্শ লেগে আছে ভূমিতে, সেখানেও কেউ টাকা পাচার করে রেখেছে কি? পরের দেশ তো দূরের কথা।

-না, না, কেউ করেনি। বিকট বিচিত্র উল্লাসে চিৎকার করে শাখামৃগরা সহমত প্রকাশ করে।

-এই করোনাকালেও দেখছেন তো, পিপিই এবং মাস্ক নিয়ে মানুষ কী নির্লজ্জ নচ্ছারপনা করলো! আর 'প্রপ্রিঞ্চি' হাসপাতালের "করোনা নেই" সার্টিফিকেট বিক্রির কাহিনি তো বিশ্বলোকে জেনেছে। এতোদিন যে দুর্নীতি হয়েছে, তাতে দেশের মানুষের ক্ষতি হয়েছে। এবারের দুর্নীতি দেশটাকেই অছ্যুত করে দিয়েছে। ছিঃ! চিকিৎসা নিয়ে কিছু বেশরম বেদরদী ব্যাবসার কথা আর কী বলবো!

তাই বেশি কিছু নয়, কয়েকটা বিষয় মানতে হবে মানুষদের। এগুলো আমার কথা নয়। কিষ্কিন্ধায় তিনদিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক শাখামৃগ সম্মেলনে বিশদ আলোচনা হয়েছে বিষয়টা নিয়ে। মানুষের নিম্নমানে নামার দ্রুত গতি দেখে তাঁরা বিচলিত, বেচায়েন হয়ে পড়েছেন। সেখানেই তৈরি হয় নালায়েক, বেপথু, বেপরোয়া, বেলেহাজ, বেলেল্লা, বেদিল, বৈনাশিক, বৈহাসিক মানুষদের কাজের গাইড লাইনগুলো। আমরাও সবাই প্রকৃতির সন্তান। সম্ভব করতেই হবে মানুষের সাথে আমাদের সহ-অবস্থান। সেজন্য মানুষকেই..., নেতা দম নেয়ার জন্য একটু থামেন।

এক নেত্রী শাখামৃগী দাঁড়িয়ে বললো, মানুষ কি আমাদের কথা মানবে নেতা?

-আলবাত মানবে। মাংকি হিলে আমরা তিন বাস ভর্তি মানুষকে কেমন শিক্ষা দিয়েছিলাম, মনে আছে তো? মুলক রাজানন্দের মতো সাহিত্যিক, ওর বউ আর বান্ধবিকে হাত জোড় করে দাঁড়াতে হয়েছিলো। ওদের পুনে যাওয়াটা বাতিল করেই দিয়েছিলাম প্রায়।

জানি, জানি, মনে আছে। বলেই হেসে ফেলে নেত্রী। অমনি বিচিত্রধ্বনির হাসির রোল উঠলো। থামতেই চায় না সে হাসি। এ ওর গায়ে পড়ে হেলে দুলে হাসছে সবাই। মনে হচ্ছে পাহাড়ের ওপর থেকে নুড়ি গড়িয়ে পড়ছে খচর মচর খিচিং মিচিং হিচিং শিচিং ঠুনুক ঠিনিক শব্দ করে।

শাখামৃগ ফিস ফিস করে তমালের কানে কানে বললো, স্বল্পতমো পোশাক পরে মানুষগুলো ঘুমিয়েছিলো রাতে। সবার সমস্ত পোশাক নিয়ে গিয়েছিলো শাখামৃগরা। কারণ, জানালার ওপর থেকে একটা কলা নিয়ে খাচ্ছিলো পিচ্চি 'চিন্নি' সোনা। মাত্র কমাস বয়স। ঐটুকু বাচ্চার কান ধরে দুই চড় মেরেছিলো একজন। শিশু প্রহার আমাদের সমাজে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ব্যাস! সকালে কেউ আর বাইরে বেরোতে পারে না। মূলক রাজানন্দের তো শর্টস পরার অভ্যেস। উদোম গায়ে শর্টস পরে সেই বেরিয়ে এসে হাত জোড় করে দাঁড়ালো প্রথমে। সাথে তার বিকিনি পরা বৌ আর বান্ধবিও। সে কী দৃশ্য! হি হি হি...

নেতা আবার কথা বলার জন্য গলা ঝেড়ে প্রস্তুত হচ্ছে, এমন সময় মিষ্টি একটা বাচ্চা শাখামৃগ 'বাবা বাবা' বলে লাফিয়ে নেতার কোলে এলো। তার হাতে একগোছা লাল টুকটুকে লিচু। কার গাছ থেকে পেড়েছে, কে জানে!

ধমকে উঠলো নেতা। বললো, এখানে কেন? মা কোথায়?

-বলেছিলাম মাকে আসতে, এলো না।

-সে জানে, অন্য মানুষদের মতো আমি বউ, বাচ্চা, অনুচর বা চাটার দল নিয়ে অনুষ্ঠানে যাই না। যাও তুমি এখান থেকে। বেশ জোরেই ধমক দেয় বাচ্চাকে আবার।

অভিমানে কেঁদে ফেললো বাচ্চাটা। তার কান্নার মিহি শব্দটা ঠিক ইস্রাফিলের শিঙ্গা ফোঁকার মতো মনে হলো। দাদি যেমন গল্পে বলেছেন, ঠিক তেমনি বাজছে তো বাজছেই। ক্রমশ বাড়ছে আওয়াজ। কী তীক্ষ্ণ আওয়াজ! ফেটেই যাবে কানের পর্দা মনে হচ্ছে। কী আশ্চর্য, আজই কি এই গ্রহটা ভেঙে গুঁড়িয়ে জাররা জাররা হয়ে যাবে? রোজকিয়ামত শুরু হয়ে গেলো? শিমুল তুলোর আঁশে ভরে গেলো ঘর। ঝাপসা হয়ে এলো ঘরের আলো। আতংকে ঘর থেকে পালাতে চাইলো সে।

একটু নড়তেই মনে হলো, কে যেনো প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলো মাথায়। তড়বড় করে নামতে গিয়ে স্ট্যাণ্ডে প্যাঁচানো মশারিসহ জবরজং অবস্থায় তমাল মেঝেতে পড়ে গেলো বেশ বেকায়দায়। চিবুকের কাছে কেটে গেলো। রক্তও পড়লো কয়েক ফোঁটা। লুঙ্গির খুঁট দিয়ে রক্ত মুছতে গেলো। টান লেগে গিট্টু খুলে গেলো লুঙ্গির।

ওই অবস্থাতেই মশারির ভেতর দিয়ে আতংকিত চোখে খুঁজলো শাখামৃগদের। নাহ, কেউ কোথাও নেই। কী আশ্চর্য! ঘর ভরা শাখামৃগরা গেলো কোথায়? অনেক কষ্টে মশারির প্যাঁচ কিছুটা ছাড়িয়ে উঠে বসে তমাল। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে তখনও। উঠে দাঁড়াতে পারছে না। মশারির ওপর বসে পড়ে আবার।

ধীরে ধিরে মনে পড়ে, গতো সন্ধ্যার কথা। দিলদারের দেয়া সরবত খেয়েই কেমন যেনো লেগেছিলো। ঢাকায় এসে এই প্রথম তার ইফতারের দাওয়াত। কানা ঘুঁষো শুনেছে আগেই, দিলদার নাকি সস্তা নেশা করে। বিড়ি সিগারেট গাঁজা চরস আফিম এই সব খায়। তা খেতেই পারে। একা মানুষ। দেশে মা বাবা ভাই বোনদের জন্যে টাকা পাঠাতে হয়। ঘর বাঁধতে পারেনি এখনও। হতাশাও থাকতে পারে। কিন্তু বন্ধুবাজ ছেলে। প্রাণ আছে। বিরাট প্রাণ। ভালো লাগে তমালের। তার দাওয়াতে তাই গিয়েছিলো। কিন্তু নেশার সরবত খাওয়ানোটা উচিত হয়নি দিলদারের।

বলেছিলো, দোস্তো সরবতটা এমন কেন?

-ও কিছু না। আমি রোজ খাই। খেয়ে নে, বায়নাক্কা করিস না।

-শরীরের মধ্যে কেমন যেনো করছে।

-একটা ঘুম দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। মনও ভালো হয়ে যাবে।

-কিন্তু জিনিসটা কি দোস্তো? কখনও খাইনি তো।

-মেয়েমানুষের মতো ঘ্যান ঘ্যান করিস না। নালায়েক, নেকু, ঢাকায় থাকবি কি করে? বলছি তো সব ঠিক হয়ে যাবে।

অনেক আয়োজন করেছিলো দিলদার। তেহারি এনেছিলো কলাবাগানের বিখ্যাত দোকান থেকে। সাথে ছিলো জিলেপি, বুন্দিয়া, কলা, খেজুর, তরমুজ, আম এবং আনারস । সত্যি দিল আছে ছেলেটার। কতোদিন খায়নি এইসব!

-এখন আম উঠেছে বাজারে? তমাল অবাক হয়।

-কী বলিস দোস্ত!, কবে থেকেই তো বাজারে আসছে আম।

-অনেক দাম না?

-তা দাম তো হবেই। যাদের সখ আছে, তারা খাবে।

-আনারস কি প্রতিবেশি দেশ থেকে আসে?

-এটা দেশের ফল। কয়েক বছর থেকে আমের আগে এই ছোটো ছোটো আনারস উঠছে বাজারে। মন্দ না। বেশ মিষ্টি। আসলে আমাদের দেশটা সত্যি সোনার দেশ রে। আমরাই হলাম খচ্চর।

হেসে বলে, এতো আয়োজন করেছিস দোস্ত।

-চোপ! মেয়েমানুষের মতো প্যানপেনে কথা বললে দেবো এক থাবড়া। এবার মন দিয়ে খা।

বাড়ি ফিরেছিলো প্রায় বারোটায়। প্রচুর ভোজন, নেশা এবং দিলদারের আপ্যায়ন সবই খুব ভালো লেগেছিলো তার। ঘরে ঢুকে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। কোনোমতে মশারিটা টাঙাতে টাঙাতেই গায়ে মশারি জড়িয়েই ধপ করে বসে পড়ে বিছানায়। নিদ্রাদেবী যেনো কোল পেতেই বসেছিলো। জাপটে নিলো কোলের ভেতর। জুতো মোজা জামা কিছুই খোলা হয়েছিলো না।

ভার্চুয়াল প্রেম

বন্ধু-অনুরোধে নাম পাঠিয়ে শান্তি নেই। মেসেজ দিচ্ছে গ্রহণ করার অনুরোধ জানিয়ে। তিনি একজন বিদেশি। একটু অবাক হয় দোলা। তবু ক্লিক করে একদিন জানতে চাইলো, বাংলা জানেন?

-জানি না। কিন্তু বুঝি।
-কেমন করে?
-আমার এক কলিগ বাঙালি।
-আমি তো শুধু বাংলাই বলবো।
-রোমান হরফের লেখা আমি বুঝতে পারি!
-থাকেন কোথায়?
-সিঙাপুর এবং পেনাং।
-দুই জায়গায় কেন?
-দুটো সংসার। দুই জায়গায় ব্যবসা করি বলে দুই জায়গাতেই থাকতে হয়।
-তারপরেও সময় থাকে বন্ধুবাজি করার জন্য?
-বহুদিন ধরে আপনাকে ফলো করছি ম্যাম। প্লিজ আমার রিকু এক্সেপ্ট করেন। আমি আপনার ফ্যান হয়ে পড়েছি।

সেইদিনই ওকে ব্লক দিলো দোলা। ফাজিল মানুষ। দুটো বউ নিয়েও শান্তি নেই। নিশ্চয় আরও বন্ধু আছে। মেয়েদেরকে বিরক্ত করাই কি ওর কাজ? এতদিন থেকে ফেইসবুকে আছে, বন্ধু সংখ্যা এখনও চার পাঁচ শো। প্রতিদিন কয়েকটা বন্ধু-অনুরোধ আসে। নিলে তো নয় বছরে কয়েক হাজার হয়ে যেতো। বেশি বন্ধু সামলাতে পারবে না তার মতো অধম, তা জানে খুব ভালো করে। তাই ব্যাকগিয়ারেই পা রাখে সে। দেশের বন্ধু নিতেই তার ভয়, বিদেশি বন্ধু দিয়ে কী করবে! যত্তো সব!

সাতদিন যেতে না যেতেই পর পর কয়েকটা বিদেশি বন্ধু রিকু পাঠালো। টিক দিলো না। ডিলিটও করলো না। বিষয়টা নিয়ে ভাবলোও না। রোজই বসে দোলা ফেইসবুকে। প্রবাসে তার খোলা জানালা এটা। লেখালেখি করতে করতে একঘেয়ে লাগলে ফেসবুকের জানালা খুলে দেয়। হেসে ওঠে পৃথিবী। কতো মুখ, কতো কথা, কতো খাজুরে আলাপ, কতো বাতুল কথা, কতো ছবি গান! আনন্দিত হয়ে যায় সে কিছুক্ষণের জন্য! কিন্তু এ কোন্ জ্বালা শুরু হলো? আগে ছিলো না তো! ওদের দেশে কি বন্ধু পাওয়া যায় না?

এবার এক রিকু এলো লন্ডন থেকে। কৌতুহল বশে তাকেও ধরলো একদিন দোলা। জানতে চাইলো, কেন সে বন্ধু হতে চায়? ইংরেজিতে লেখালেখি হয়।

- তোমাকে দেখে আমার ভালো লেগেছে।
-সেটা তো ছবি। আমার নাও হতে পারে।
- অসম্ভব। আমি জানি, এটা তোমারই ছবি।

বাপ্স! এটা তো দেখা যায় অন্য কিসিমের চিড়িয়া। সাক্ষাৎ গনক ঠাকুর! লেখে, করো কী? বয়স কতো?

- স্টিল মিলে কাজ করি। নাম, উইলমন্ড।
- সেতো দেখতেই পাচ্ছি।
- লন্ডনে বাসা আছে আমার।
- তো?
- তুমি বেড়াতে আসো। বন্ধুত্ব পাকা করি। নতুন কিচেন কিনেছি। দুই জনে শেয়ার করতে পারবো। বড়োই আছে মোটামুটি।

কথা শুরু হতে না হতেই গদগদ ঢলো ঢলো ভাব। একেবারে কিচেন শেয়ারিং! মনে মনে হাসে দোলা। নিশ্চয় বোতল খেয়ে কথা বলছে। বলে, আজ রাখি, পরে কথা হবে।

পরদিন ফোন করলো উইলমন্ড। হাই, কেমন আছো দোলা?
লেখালেখি বাদ দিয়ে একেবারে ফোন! বেশ অবাক হয় দোলা! তবু বলে, ভালো। লেখালেখিই তো ভালো ছিলো।
-মাই গুডনেস! কী সুইট তোমার কণ্ঠ!
হেসে ফেলে দোলা। বলে, কেমন আছো ?

-তোমাকে না পেলে ভালো থাকবো না বন্ধু।
-পাগল নাকি? বলছো কী এই সব?
-সত্যিই বলছি। কাল সারারাত তোমার ছবির দিকে তাকিয়ে ছিলাম।
- আজ তোমার কাজ নেই?
- যাবো না। ছুটি নিয়েছি। ব্যথা পেয়েছি হাতে। রেস্ট নেবো।
- রেস্ট মানে তো লম্বা ঘুম। যাও, পেইন কিলার খেয়ে ঘুমাও গিয়ে।
- ঘুম আসছে না। শুধু তোমার কথা মনে হচ্ছে। কাছে পেতে ইচ্ছে করছে।

শালা পাগল। নির্ঘাত পাগল। হ্যাংলার মতো কথা বলছে উইলমন্ড। কী মনে করে ওরা মেয়েদেরকে? কী উদ্দেশ্য নিয়ে বন্ধুত্ব চাইছে? সভ্য দেশের প্রেমের ধারা কি এই রকম? উপনিষদ মার্কা? 'চারিচক্ষের মিলন হইলো। সামান্য বাদে অন্যরকম মিলনও 'হইলো'। চক্ষের মিলনও তো হয় না ফেইসবুকে!

কিন্তু কথা বলতেও ইচ্ছে করছে দোলার। পুরুষ বন্ধু তাদের জীবনে কল্পনাও করা যায় না। তবে পুরুষের সাথে কথা হয়। তারা আত্মীয়, প্রতিবেশি, নয়তো স্নেহভাজন কেউ বা কাজের লোক, এমনি। এমন করে কারও সাথে কথা হয়নি। প্রযুক্তি শুধু আকাশ খোলেনি, মানুষের মনও খুলে দিয়েছে। কতো সাধ্য সাধনা করে সুকুমার বৃত্তিগুলোকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়। প্রযুক্তি কী অনায়াসে সেই ঘুম ভাঙায়! সাত সমুদ্র তেরো নদীর ব্যবধানে বসে তাই অচিন লোকের সাথে বন্ধুর মতো কথা বলা সম্ভব হচ্ছে। চুয়াত্তর বছর বয়সে নতুন অভিজ্ঞতা। চিন্তা একটাই, কাজটা ঠিক হচ্ছে কিনা?

তিনদিন পরে আবার ফোন করে উইল। বলে, এখন তো সামার, চলে এসো না, আমরা আইসল্যান্ডে বেড়াতে যাবো।

ছোট্ট ঘুর্ণিঝড় বয়ে গেলো মনের জমিনে। তার মানুষটা তো এমন করে বলেনি কোনোদিন। টাকা ছিলো, কিন্তু সখ ছিলো না। কৃপনও ছিলো। সংসার সন্তান তার ঘাড়ে ফেলে একা একা বেড়াতো। সামলে নিয়ে দোলা বলে, তোমার দেশ কোথায়?

- গ্রেট বৃটেন, স্কটল্যান্ড।

-তোমার উচ্চারণ তা বলে না কিন্তু।

-আমার মায়ের দেশ ইতালি। তুমি চাইলে ইতালিতে, ভেনিসে, রোমেও যেতে পারি। ক্রোয়েশিয়াও হতে পারে। বলো কোথায় যাবে?
-তাই তো বলি! দোলা হাসে। মাতৃভাষার উচ্চারণ লুকোবে কোথায়?
- আই লাভ ইউ দোলা।

ওরে আমার সারিন্দা রে! সে বলে কী, আর সারিন্দা বাজায় কী? তবু চমকে ওঠে দোলা। কী বলে এই সব লোকটা? ভালোবাসা এতোই সহজ?

তবু ধুকপুক করে বুকের মধ্যে। শব্দটার ব্যঞ্জনা ঐশী সুরের মতো। বকাবকি করতে পারতো দোলা। পাগলাটে বলেই করেনি। তাছাড়া এতো সহজে এখন আর রাগ হয় না। পৃথিবীতে কতো রকম পাগল আছে! রাগও করতে পারেনি ওর ওপর। বেচারা ভালোবাসার কথাই তো বলেছে। কে জানে, হয়তো একা থাকে। বঞ্চিত নিঃসঙ্গ জীবন। প্রবাদটা মনে পড়ে দোলার, 'চারদিকে পানি, কিন্তু একফোঁটা পানি নেই খাওয়ার।' ফ্রি সোসাইটিতে থাকে। রমণী কূলকামিনীতে ভরা দেশ, তবু একা থাকে। জীবনের কী পরিহাস!

দোলা শুনেছে, ফেইসবুকের আলাপ থেকে প্রেম হয়, বিয়েও হয়। কিন্তু সেতো বয়সি মহিলা। চুয়াত্তর বছর বয়স। প্রেম বিয়ে কোনোটাই হবে না। উইল বলেছিলো, তার বয়সও চুয়াত্তর। এখনও তবে বন্ধুবাজির হাউস আছে তার? অবাক হয় সে! প্রাণটা তাহলে তাজা আছে। দেশের মেয়ে পায় না? সব ছেড়ে বাংলি বয়সি মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব! প্রেম! বয়সকে উইল বলে, 'নাম্বারস'। ও কিছু না। মনই হলো আসল।

হতভাগা, জানো না তো, আমাদের দেশে সবচেয়ে আগে মারতে হয় মনকে। কেউ বুঝতে চায় না, বয়স হলেও মানুষের মধ্যে সব সুকুমার অনুভূতিই থাকে। সমাজের অয়োময় অদৃশ্য প্রাচীরে শক্ত করে ঘেরা। ছেলেরা বয়স হলেও অনেক কিছু বলতে পারে, মেয়েরা পারে না। ছেলেরা অনেক কিছু করতেও পারে, মেয়েরা চোর হয়ে থাকে। চুয়াত্তর বছর বয়সে প্রেম ভালোবাসার কথা কোনো বয়সি মেয়ে বললে পাবনার পাগলা গারদে বেঁধে নিয়ে যাবে পরিবার, সমাজ। আপন মনে হাসে দোলা।

কিছুদিন পর বন্ধ হয়ে গেলো উইলের সাথে গল্প করা। আহারে মানুষ! কিচেন শেয়ার, বিশ্ব ভ্রমণ, লন্ডনে বেড়াতে যাওয়া, সব হাওয়া হয়ে গেলো। ওর পক্ষ থেকেই বন্ধ হয়ে গেলো ফোন। হয়তো ফেইসবুকেই অন্য কারো

দিকে লাইন দিয়েছে। ব্যাক্টেরিয়ার মতো সবাইকে কামড়ে বেড়ায় তো। থিতু হতে চায় না। এই জন্য এরা একা। কয়েক সেকেন্ডেই জানে জিগরি দোস্ত হয়ে যায়। পারলে মাথায় তুলে নেয়। বিছানায় নিয়ে শোয়। তারপরই শেষ হয়ে যায় আকুল ব্যাকুল দোস্তালি। উতল মাতাল প্রেম। কেমন জীবন যাপন করে এরা?

দিন যায়। তিনচার মাস পর আবার এক বিদেশি বন্ধু-অনুরোধ আসলো। পাত্তা দিলো না দোলা। দুর, উটকো ঝামেলা সব। কয়েকবার নক করলো। উইলের কথা ভুলেই গিয়েছিলো একেবারে। আবার কোন্ উৎপাত? কথা আছে না, পাপের আকর্ষণ বেশি। দোলা ভাবে, দেখাই যাক না, এই বিদেশি কেমন করে প্রেম করে? ক্লিক করে একদিন। খুলে যায় ফেইসবুকের আকাশ জোড়া দেয়াল।

নিঃশব্দ অক্ষর ভেসে উঠলো, আমার নাম ফিলিপ, দেশ আমেরিকা। থাকি ওয়াশিংটন ডিসি-তে।

দোলা প্রশ্ন করে, বন্ধু হতে চাও কেন ?

- তোমার ছবি দেখে আমি মুগ্ধ।
- ওটা পুরনো ছবি। আমার প্রোফাইল দেখেছো?
- না। ছবিই যথেষ্ট বন্ধু।
-তোমার ছবি কবেকার?
- এই বছরের জানুয়ারি মাসের।
- তুমি তো বাংলা জানো না। কথা বলবে কীভাবে?
- এখন যেমন ভাবে বলছি।
- মানে, ইংরেজিতে?
- হোয়াই নট?
- কী নিয়ে কথা বলবো আমরা?
- জগতে টপিকের আকাল আছে কি?
- তা নেই। 'করোনা' কালে কিছুই ভালো লাগে না।
- বাংলাদেশের অবস্থা কেমন?
- বেশ খারাপ।
- সে তো আমেরিকাতেও খুব খারাপ।

- তোমার প্রফেশন কী?
- সিভিল ইঞ্জিনিয়র।
- তোমার?
- প্রোফাইল দেখে নাও, তারপর আবার কথা হবে, নো মোর টুডে, ওকে।

নিঃসঙ্গ দোলার খারাপ লাগছে না কথা বলতে। আঠারো বছর হলো মানুষটা চলে গেছে। তারপর থেকে শূন্য জীবন। এই চুয়াত্তর বছর বয়সেও পূর্ণিমা রাতে মন কেমন করে। খুব মনে পড়ে আটতিরিশ বছরের জীবনসঙ্গী মুস্তাকিমকে। হরিহর আত্মা ছিলো না তারা, কিন্তু ভালো সময়ও তো কেটেছে তাদের।

নির্ঘুম রাতে মনে হয়, ও যদি গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতো, তাহলে হয়তো ঘুম এসে যেতো। সে তো আর হবে না ইহ জীবনে। কী হবে এই সব বন্ধুত্ব টন্ধুত্ব দিয়ে? তবে এটা ঠিক, দেশে কারও সাথে এমন করে কথা বলা যাবে না। দেশের কেউ আর কোনও দিন বন্ধু হবে না। বিধবা বুড়ো মানুষের আবার জীবন কী? বন্ধু কী? এখন জীবনে প্রাণ থাকাটাই নিন্দনীয়। ধর্ম কর্ম করেই সময় কাটাতে হবে। এটাই তো হয়ে আসছে। ব্যতিক্রম দেখে অভ্যস্ত নয় কেউ। ভেবেও না।

হোয়াটস এপ-এ মেসেজ এলো। মোবাইল খুলে দেখে ফিলিপ। ছোট্ট ম্যাসেজ, হাই সুইটি।

মুখ টিপে হাসে দোলা। সে আবার সুইটি হলো কখন? একদিন হাই হ্যালো হতেই কেউ সুইটি হয়? এও তো দেখি পাগল! আরও বড়ো পাগোল। আসলে এদের সংস্কৃতিটাই আলাদা। বচন বাচন মনন ধরণ ধারণ অন্যরকম। দোলা টাইপ করে, ফেইসবুক কী হলো?

-ডাজেন্ট ওয়ার্ক। দুই এক দিনের মধ্যে আর একটা একাউন্ট খুলে নেবো। আপাতত হোয়াটস এপ-এ কথা বলা যাক, কি বলো?

- ওকে। নো প্রব্লেম। আমার প্রোফাইল দেখেছো?
- দেখেছি।
- জন্ম সাল দেখেছো?
- অফ কোর্স।
- তোমার প্রোফাইল তো অসম্পূর্ণ।

- মানে, জন্ম সাল লেখা নেই, এই তো? আমার বয়স তেতাল্লিশ।
খুব জোরে হেসে ওঠা দোলা। লেখে, লোল (Lol)।
- কেন? হাসির কী হলো?
- আমার চেয়ে একতিরিশ বছরের ছোটো এক বিদেশির সাথে আমি বন্ধুত্ব করবো?
- সমস্যা কোথায়? বয়স তো শুধু নাম্বার।

চমকে ওঠে দোলা। এও একই কথা বলছে! বিদেশিরা বয়সকে সত্যি নাম্বার মনে করে? দেশের প্রবাদ 'কুড়িতেই বুড়ি' মনে পড়ে। লেখে, এইরকম বন্ধুত্ব আমি কখনও দেখিনি ফিলিপ।

- বন্ধুত্ব ইজ বন্ধুত্ব। বয়সে কী যায় আসে সুইটি।

কথা নেই বার্তা নেই, 'সুইটি' ডাকটা রপ্ত করে ফেললো? বৌ শুনলে ঝাঁটা পেটা করবে। দোলার কেমন যেনো লাগে। কথা খুঁজে পায় না। লেখে, লাঞ্চ করেছো?

- জাস্ট ডান।
- কী খেলে?
- শুধু ফলমূলের ককটেইল। তুমি?
- আমরা ভেতো বাঙলি। মাছ, ভাত, সবজি খেলাম।
- তুমি রান্না করো?
- মাঝে মাঝে করি। তুমি রান্না করতে পারো?
- বেশ পারি। একা মানুষ। বেশির ভাগই কেনা খাবার। গরম করে নিলেই হলো।
- একা কেন?
- বৌ চলে গেছে। ছয় বছরের বাচ্চাটা থাকে আমার মায়ের কাছে।
- সরি।
- নো ম্যাটার। দিস ইজ লাইফ হানি। তোমার কথা বলো।

আরে! আবার হানি বলে! বকা দেবে না কি? কিন্তু এতোই স্বাভাবিকভাবে বলছে, মনে হচ্ছে কতোদিনের পরিচয়। মন্দ লাগছে না শুনতে। ভাবে, আমাদের মানুষেরা বৌকে এইসব মনহরা বিশেষণে ডাকতেও জানে না কেন? কথা বলতে তো টাকা লাগে না! অন্তত তাকে তো ডাকেনি

মুস্তাকিম। লেখে, আমিও একা। আমাকে ফেলে ও চলে গেছে আঠারো বছর আগে।

- তারপর?
- তার আর পর নেই।
- তোমার জীবনে আর কোনও পুরুষ আসেনি?
- না। আমাদের দেশে এটাই স্বাভাবিক। আমার অনেক বড়ো সংসার। ছেলে মেয়ে নাতি পোতা আছে। কেটে যায় দিন।
- সো হোয়াট। লাইফ ইজ ইওরস। ইউ আর স্টিল ইয়ং।
- ওরকম ভেবে অভ্যস্ত নই আমরা।
- আবার যদি কেউ প্রপোজ করে?

লাফিয়ে লাফিয়ে এগোচ্ছে দেখা যায়। লেখে, এই বয়সে?

- ইউ আর সো প্রিটি হানি। ইনজয় ইয়োর লাইফ।

- প্লিজ, ছাড়ো এসব কথা।

- হোয়াই ডার্লিং? আমি যদি প্রপোজ করি?

আর সহ্য হয় না দোলার। শির শির করে ওঠে সারা শরীর। লেখে, আজ থাক, পরে কথা হবে। মোবাইলটা হাতে ধরা। কিছু একটা লেখছে দেখা যায়।

ফিলিপ লেখেছে, আই লাভ ইউ ডার্লিং। মাই বেবি। ইউ আর মাইন।

পাগল, পাগল, তস্য পাগল। উন্মাদ! 'লাভে' র বাচ্চা সব। ভালোবাসা এদের কাছে এতো সড়সড়ে? সুইটি, হানি, ডার্লিং, বেবি, ঠোঁটের আগায় থাকে। শব্দগুলো যেনো কিছু নয়। কথার কথা। তবে বেবি সম্বোধনটা নতুন। মানেটা কী?

দোলা ভাবে, দেখা যাক না কোথাকার পানি কোথায় যায়! তামাশা বই তো নয়! তবে একটা কথাও মনে জাগছে, নিশ্চয় এদের কোনো উদ্দেশ্য থাকে। দেশ কিছু নয়, ভাষা কিছু নয়, বয়স কিছু নয়। জাত ধর্ম তো বাদই গেলো। কোনটা তাহলে কিছু? সেই কিছুটা, তাহলে কী?

পরদিন আবার ম্যাসেজ আসে। লেখা, কেমন আছো ডার্লিং?

- ভালো।
- কী করছো?

- নিঃসঙ্গ মানুষ যা করে। বই পড়ছি।
- তুমি একা নও। আমি আছি পাশে হানি। জাস্ট ফিল মি এট ইয়োর সাইড।

'ম্যায় হুঁ না'-র মতো ডায়ালগ! দোলা লেখে, লোল (Lol)। কোথায় তুমি, আর কোথায় আমি!

- হেসো না, হেসো না, তোমাকে নিয়ে আসবো এখানে।
- তুমি কি সত্যি পাগল?
- আই লাভ ইউ ডার্লিং। আমি তোমাকে বিয়ে করে ঘরে আনবো। বাকি জীবন আমরা একসাথে থাকবো। কেউ বন্ধ করতে পারবে না।
- আমি তো জীবনের পর্যটন শেষ করেই এনেছি।
- সব ফিরিয়ে দেবো তোমাকে আমি। ফিরিয়ে দেবো বয়স, ফিরিয়ে দেবো জীবনের তারুণ্য। ফিরিয়ে দেবো বসন্ত। তুমি শুধু আমার হবে। শুধু আমার।

প্রচণ্ড একটা ধাক্কা লাগে মনে। ভূমিকম্পের মতো কেঁপে ওঠে শরীরের জমিন। কী অসম্ভব কথাবার্তা! দোলার বুকের মধ্যে রোমাঞ্চ ঝিঁ ঝিঁ পোকার মতো শব্দ করতে থাকে। চুপ করে থাকে সে। কেন এই সব কথা বলছে ফিলিপ? তেতাল্লিশ বছরের ভর যৌবনের টগবগে মানুষ, বিয়ে করবে চুয়াত্তর বছরের বুড়ো এক মহিলাকে। অবাস্তব কথা বলে যায় কী অনায়াসে! কিন্তু বলছে কেন? জাস্ট ফান? কৌতুক? অথবা?

ম্যাসেজ আসে, তোমার হবি কী?
- বইপড়া, লেখালেখি করা।
- আমার হবি, গান শোনা, লং ড্রাইভে যাওয়া।

নাহ, ওকে জিততে দেয়া যাবে না। দোলা ভাবে, একটু খেলতেই হয়। সবই তো চোখের আড়াল। ভিডিও কল হয়নি এ পর্যন্ত। ফোনেও কথাও হয়নি। দোলা লেখে, আমিও লং ড্রাইভ পছন্দ করি।

- এমেইজিং। কী মিল আমাদের দেখো কুইনি। আ পারফেক্ট ম্যাচ।
একা ঘরে শব্দ করে হাসে দোলা। লেখে, চলো যাই কোথাও।
- তুমি এলে ডিসি (ওয়াশিংটন ডিসি) পুরো ঘুরবো।
- এখনই চলো।
- কেমন করে হানি?

- চোখ বন্ধ করো। তিরিশ সেকেন্ড চোখ বন্ধ করে রাখো। তারপর খোলো। দেখবে আমরা ঘুরে এসেছি।
- এমেইজিং ডার্লিং। তোমার মতো স্বপ্নবাজ একটা বৌ দরকার ছিলো আমার।
- আজ রাখি, পরে কথা হবে।
- ওকে মাই ওয়াইফ। মাই সুইট ডার্লিং।

উহ, কান মন শরীর তপ্ত হয়ে যায়। শব্দগুলোর শক্তি আছে! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করে দোলা। এই বয়সে এমন লাগে নাকি কারও? ভাবে, ঠিক হচ্ছে কী এমন প্রেমের খেলা? চিরাচরিত সংস্কারে কট কট করে টান পড়ে। কোথায় যেনো মূল্যবোধও মৃদু খোঁচা দেয়। ঠিক হচ্ছে কী?

দোলা প্রায় নিশ্চিত, লোকটার কোনো উদ্দেশ্য আছে। কেন এ রকম মনে হচ্ছে, তা জানে না। উইলকে তো দেখলো। একটা ফটকা! কিন্তু ফিলিপের কী উদ্দেশ্য হতে পারে, সেটাও বুঝতে পারছে না। এমন গায়ে পড়া প্রেম তো স্বাভাবিক না। যথেষ্ট বাকপটুও মানুষটা। শেষে কোনো ফাঁদে পড়বে না তো? তাই বা কেমন করে হবে ? হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান। তবে ইন্টারনেটের যুগ। ও কি গুপ্তচর? সাবধানেই তো কথা বলে দোলা। দেশের বিরুদ্ধে একটা শব্দও তো উচ্চারণ করেনি সে।

সাইবার ক্রাইমের গল্প শোনা যায়। সেটা নাকি ভয়ঙ্কর! কিন্তু এই সামান্য কথা, খেলা খেলা বায়বীয় প্রেম, দুইচারটে বিদেশি অভ্যেসের মিঠি মিঠি শব্দের উচ্চারণ, এসব থেকে কী আর হতে পারে? সাহসী হয়ে উঠতে চায় সে। নাহ! এমন খেলায় দোষ নেই। বিপদ নেই। খেলাই যাক একটু।

সারারাত কানের কাছে সুইটি, হানি, ডার্লিং, মাই ওয়াইফ, শব্দগুলো বাজতে থাকে। বড্ড ঘুমের ব্যাঘাত হলো দোলার। যতোই মনে করতে চেষ্টা করে, ওগুলো ফালতু লোকের ফাজলামির শব্দ, ততোই ব্যঞ্জনা নিয়ে শব্দগুলো গান হয়ে ওঠে। কেমন এক ভালো লাগার রোমাঞ্চে আবেশ জাগে শরীরের লক্ষ কোটি কোষে, হৃদয়ের তন্ত্রিতে তন্ত্রিতে। বিরক্ত হয়ে ওঠে দোলা নিজের ওপরেই।

প্রতিদিন ছোটো ছোটো ম্যাসেজ আসে। আজকাল কিছুই আর গোপন থাকে না। সময় হিসেব করে দেখে দোলা, গভীর রাতে লেখা ম্যাসেজগুলো।

একদিন লেখে, রাতে ঘুমোও না?

- খুব ডিস্টার্বড থাকি। ভালো ঘুম হয় না। তুমি পাশে থাকলে এমন হতো না হানি।

- উইকেন্ডে খুব পান করেছো বোধ হয়।

- তোমার সাথে বিছানায় খুনশুটি করেছি।
- ভাষা তো জানো না। মাতৃভাষা না হলে খুনশুটি হয়?
- তাতে কী? তোমাকে আস্তে করে বিছানায় শোয়ালাম। আনড্রেস করলাম। তোমার সারা শরীর স্পর্শ করলাম। লীলা শেষে একসাথে বাথ নিলাম। ঘুমোবো কখন?

ফোন বন্ধ করে দেয় দোলা। অসহ্য! অসহ্য! কেমন করে পারে মানুষ এইসব কথা বলতে? আসলে কথাই যাদু। কথা দিয়েই মানুষকে ভোলায় মানুষ। তারই যদি শিহরণ জাগে, নেশার মতো লাগে, তাহলে কিশোরী কন্যারা তো রোমাঞ্চিত হবেই। গলেও যাবে এক সময়।

ম্যাসেজ আসে, কথা বলো ডার্লিং। কবে আমরা একসাথে থাকতে পারবো?

- তোমার কথা শুনে লজ্জা পাই ম্যান। কী যে সব বলো!
- আমার কাছে তোমার লজ্জা কী মাই কুইন, মাই লাভ?
- আজ থাক, পরে কথা হবে, ওকে?
- গিভিং আ টাইট হাগ ডার্লিং। ডু ইউ ফিল?
- প্লিজ, এসব ভাষায় কথা বলো না।
- হোয়াই নট? ইউ আর মাই ওয়াইফ। মাই কুইন। টেইক আ লং কিস।

বন্ধ করে দেয় দোলা ফোন। বড্ড বেশি বেয়াড়াপনা করছে ফিলিপ।

আকুল ব্যাকুল চিন্তায় দোলা অস্থির। প্রেমে পাগলের মতো করছে কেন লোকটা? জীবনের দিনগুলো তাকে নিয়েই নাকি কাটাবে। জীবনটা কি রূপকথার গল্প? ইচ্ছে হলো আর বিশাল ঈগল পাখির পিঠে চড়ে ধবল মেঘের বাড়ি গিয়ে বসলো? চাঁদ মামা এসে কপালে চন্দনের টিপ পরিয়ে দিলো? তারারা নিয়ে এলো সুবাসিত ফুলের মালা। দেবদূতেরা এসে শুরু করল নাচ গান। ফিনিক্স পাখিরা নিয়ে এলো বেশুমার সুখাদ্য। আহা, সখ কতো! কিন্তু এখনও ফিলিপের উদ্দেশ্য ধরতে পারলো না দোলা। একটা কিছু অবশ্যই আছে এর মধ্যে। এমন হঠকারি প্রেম বিশ্বাসযোগ্য নয়। কেউ কারও কণ্ঠ শোনেনি। ভিডিও কল করে চেহারা দেখেনি। ওকি ছেলে, না

মেয়ে? কালো না ধলো? লম্বা না খাটো? মোটা না পাতলা? সেটাও তো প্রশ্নবিদ্ধ।

প্রতিদিন কথা হয়। প্রায় দুসপ্তা হতে চললো। কুয়াশা কাটলো না। একদিন আবার বলে, একটা কথা তোমাকে শেয়ার করতে পারি ডার্লিং?

- ভরসা থাকলে বলো।
- আমি একটা প্রাইভেট বিজনেস, মানে রিয়াল স্টেটের ব্যবসা করি। হঠাৎ টাকার সমস্যায় পড়েছি। প্রকট সমস্যা।'
- তারপর?
- তুমি কিছু টাকা দাও না। তিনমাসের মধ্যে ফিরিয়ে দেবো। কথা দিচ্ছি।

মেঘলা আকাশে বিদ্যুৎ চমকে গেলো। শাখা প্রশাখা মেলে বিদ্যুতশিখা যেনো চিরে চিরে দিলো শান্ত নিরীহ নিটোল আকাশের গা। এতোগুলো বিগ ব্যাঙের দহ আকাশের গায়ে? এই তবে উদ্দেশ্য! দোলার চোখ খুলে গেলো। তার ধারণাই ঠিক। প্রেমের ফাঁদে ফেলে টাকা বাগিয়ে নেয়াই তাহলে উদ্দেশ্য! প্রফেশনাল লাভার দেখা যায়। এরাতো চারুবাক হবেই।

দোলা লেখে, আমি প্রবাসী। পরজীবী জীবন। আমার তো টাকা নেই ধার দেয়ার মতো।

- কোথাও থেকে জোগাড় করো, প্লিজ হানি। কঠিন অবস্থা আমার।

দোলা তো বুঝেই গেছে ফিলিপের প্রেম কি জন্য? তার মুখের 'হানি'তে কতো বিষ! গল্প শুনেছে ধনাঢ্য বিধবাদেরকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে, কেউ কেউ বয়সী মহিলাকে বিয়ে করে তার সমস্ত টাকা আত্মসাত করেছে। ফিলিপ কি তাকে ধনাঢ্য বিধবা ভেবেছে? আহারে আবাল! তবু খেলাটার শেষ দেখতে চায় দোলা।

আবারও ম্যাসেজ এলো, আমার জন্য কিছু করতে পারলে হানি? যা পারো তাই দাও। কাজে লাগবে। আমার কথাটা ভাবো ডার্লিং।

- সরি ম্যান, পারছি না।
- প্রেম কিন্তু শুধু ঠোঁটে নয় হানি।
কুৎসিত শোনালো কথাটা। লেখলো, প্রেম টাকার শর্তও নয়।

দোলা ভাবে, রিয়েল স্টেটের ব্যবসায় "যা পারো তাই দাও", কথাটা বেমানান। ওর লাগার কথা হাজার হাজার ডলার। দুচার শোতে কী হবে? বলেছে ব্যাংক থেকে ধার নিলে হাই ইনটারেস্ট। তাই বন্ধু বান্ধবের কাছে হাত পাতা।

আবার ম্যাসেজ, সুইটি, তোমার বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে জোগাড় করে দাও না।

- প্লিজ আমাকে লজ্জা দিও না, দোলা লেখে। ভাবে, হ্যাংলামি হয়ে যাচ্ছে না! আত্মসম্মানও কম। পরিচয় হতে না হতেই টাকা ধার চাওয়া।

দুদিন চ্যাট হলো না। মন তেতো হয়ে গেছে দোলার। ফিলিপও ম্যাসেজ দিলো না। আবার ম্যাসেজ, আমাকে সাহায্য করার জন্য তুমি চেষ্টা করলে না।

- কি বলছো ডিয়ার? ইচ্ছে করেই দোলা সম্বোধনটা করে। খেলা তো শেষ হয়ে গেছে, সন্দেহ নেই। রেফারির বাঁশি বাজুক আর নাই বাজুক।
- আমি জানতাম, তুমি আমাকে টাকা দেবে না।
- অবিশ্বাস করছো? বলেছি, আমার টাকা নেই। তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে আমার কথা। আর বিশ্বাসই যদি না থাকে, তাহলে বন্ধুত্বও হয় না। ভালোবাসা তো বহু দূরের কথা ফিলিপ।

তারপরেও কিছু কথা হলো। দমে দমে 'সুইটি, কুইনি, মাই লাভ, মাই ওয়াইফ, হানি, হাগিং, কিসিং সব মিসিং হয়ে গেলো। বোঝাই গেলো, ভার্চুয়াল প্রেম খতম 'মানি'র অভাবে। কী বিশ্রি একটা খেলা! এরাও তো এক রকম সাইবার ক্রিমিন্যাল!

দোলা 'গুড বাই' বলতে পারতো। বলেনি। নিষ্ঠুরতা হয়ে যেতো হয়তো। প্রেমের খেলা তো সেও খেলেছে। প্রেমের সম্বোধনগুলো তো ভালো লাগতো। দেহে মনে কেমন এক আলোড়োন তুলে দিয়েছিলো ফিলিপের কথা, সম্বোধন। এই বয়সে জীবনের রুক্ষ্ম বঞ্চনাকে ক্ষণিকের জন্য হলেও রোমাঞ্চের মদির অনুভবে নাড়িয়ে দিয়েছিলো। কদিনের রোমান্স। না চাইতে পাওয়া। তবে হেরেই তো গেছে ফিলিপ। তাহলে আর শাস্তি দেয়া কেন? ভব্যতাটুকু তার ক্ষণিক আনন্দের দাম হয়েই থাক।

মনে মনে বলে দোলা, গুড বাই ফিলিপ। গুড বাই অচিন বন্ধু।